গল্প

ফটিকচাঁদ
অনাথবাবুর ভয়
বাতিকবাবু
বারীন ভৌমিকের ব্যারাম
ভূতো
সাধনবাবুর সন্দেহ
অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু
গগন চৌধুরীর স্টুডিও
অনুকূল
গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট
শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত

ফটিকচাঁদ

ও যে কখন চোখ খুলেছে ও জানে না। চোখে কিছু দেখার আগে ও বুঝেছে ওর শীত করছে, ওর গা ভিজে, ওর পিঠের তলায় ঘাস, ওর মাথার নিচে একটা শক্ত জিনিস। আর তার পরেই বুঝেছে ওর গায়ে অনেক জায়গায় ব্যথা। তবু ডান হাতটাকে তুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে মাথার পিছনে নিতেই হাতে ঠাণ্ডা পাথর ঠেকল। বড় পাথর, হাত দিয়ে সরাতে পারবে না। তার চেয়ে মাথাটা সরাই না কেন ? ও তাই করল, আর তাতে ও আর একটু চিত হয়ে গেল।

এবার ও বুঝল ও দেখতে পাচ্ছে। এতক্ষণ পায়নি তার কারণ এখন রাত, আর ও শুয়ে আছে আকাশের নিচে, আর আকাশে মেঘ ছিল। এখন মেঘ সরে যাচ্ছে আর জ্বলজ্বলে তারাগুলো বেরিয়ে আসছে।

ও বুঝতে চেষ্টা করল ওর কী হয়েছে। এখন ও উঠবে না। আগে বুঝে নেবে ওর কী হয়েছে ;—ও কেন ঘাসের উপর শুয়ে আছে, কেন ওর গায়ে ব্যথা, কেন ওর মাথাটা দপদপ করছে।

ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে একটানা ?

একটু ভাবতেই ওর মনে পড়ল। ওটাকে বলে ঝিঁঝি পোকা। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকে কি ? না, ডাকে না। ঝিঁঝি পাখি নয়, ঝিঁঝি পোকা। এটা ও জানে। কী করে জানল ? কে বলেছে ওকে ? ওর মনে নেই।

ও ঘাড়টা একটু কাত করল। মাথাটা ঝনঝন করে উঠল। তা করুক। ও বেশি না নড়ে এদিক-ওদিক দেখে নেবে। ও এখন এ-সময়ে এখানে কেন, সেটা জানতে হবে।

ওটা কী ? তারাগুলো আকাশ থেকে নেমে এল নাকি ?

না। মনে পড়েছে। ওগুলো জোনাকি। জোনাকি অন্ধকারে দপদপ করে

জ্বলে আর ঘুরে ঘুরে ওড়ে। জোনাকির আলো ঠাণ্ডা আলো। হাতে নিলে গরম লাগে না। কে বলেছে ওকে? মনে নেই।

জোনাকি মানে ওখানে গাছ। গাছের আশেপাশেই জোনাকি ঘোরে। আর ঝোপেঝাড়ে ঘোরে জোনাকি। ওখানে অনেক জোনাকি। ওই যে কাছে, আবার একটু দূরে, আবার অনেক দূরে। তার মানে অনেক গাছ। অনেক গাছ একসঙ্গে থাকলে কী বলে? মনে পড়ছে না।

ও এবার অন্যদিকে মাথা ঘোরাল। আবার মাথাটা টনটন করে উঠল।

ওদিকেও অনেক গাছে অনেক জোনাকি। গাছের মাথা আকাশে মিশে গেছে, দুটোই এত কালো। আকাশে তারা এক জায়গায় থেমে জ্বলজ্বল করছে, গাছে জোনাকি ঘুরে ঘুরে জ্বলজ্বল করছে।

ওদিকের গাছগুলো দূরে, কারণ মাঝখানে রাস্তা। রাস্তায় ওটা কী? আগে দেখেনি, এখন দেখছে, ক্রমে দেখছে।

একটা গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে। না, দাঁড়িয়ে না; এক পাশে কাত হয়ে আছে। গাড়ির পিছনটা এখন ওর দিকে।

ওটা কার গাড়ি? ও ছিল কি ওটার মধ্যে? কোথাও যাচ্ছিল কি? ও জানে না। ওর মনে নেই।

গাড়িটাকে দেখে কেন জানি ভয় করল ওর। শুধু ও আর গাড়ি—আর কেউ নেই। কোনো মানুষ নেই; শুধু ও নিজে মানুষ। আর গাড়িটা কাত হয়ে ওর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ও জানে উঠলে ব্যথা লাগবে। তাও ও উঠল। উঠেই আবার পড়ে গেল। তারপর আবার উঠে এগিয়ে গেল গাছের দিকে, গাড়ির উলটো দিকে।

এটা জঙ্গল। একে বলে জঙ্গল। মনে পড়েছে। এখনো রাত। এখনো অন্ধকার। তাও বোঝা যায় জঙ্গল। একটু একটু দেখতে পাচ্ছে ও। তারার আলোয় তাহলে দেখা যায়। চাঁদের আলোয় আরো বেশি। সূর্যের আলোয় সব কিছু।

ও তিনটে গাছ পেরিয়ে চারের পাশে এসে থেমে গেল। ওর সামনে শুধু গাছ নয়, আরো কিছু আছে। একটু দূরে। ও গাছের গুঁড়ির পিছনে নিজেকে আড়াল করে মাথাটা বার করে ভালো করে দেখল।

একপাল জন্তু। তারা একসঙ্গে হাঁটছে, তাই খসখস শব্দ হচ্ছে। ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে, তাই পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওই যে মাথায় শিং—একটার, দুটোর...আরেকটার। ওগুলোকে হরিণ বলে। ওর মনে আছে। একটা হরিণ হঠাৎ থেমে মাথা তুলে দাঁড়াল। অন্যগুলোও দাঁড়াল। কী যেন শুনছে।

এবার ও-ও শুনল। একটা গাড়ির আওয়াজ। দূর থেকে এগিয়ে আসছে

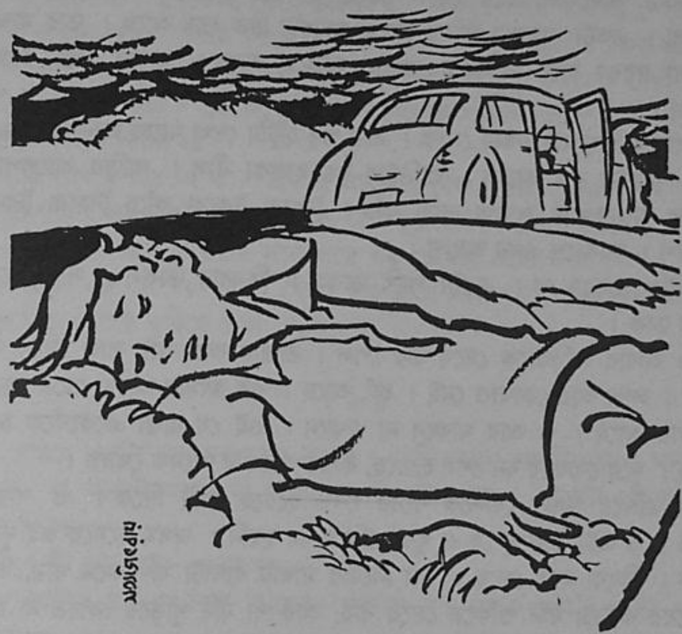

গাড়িটা।

হরিণগুলো পালাল। লাফ দিয়ে দৌড় দিয়ে পালাল। এই ছিল, এই নেই। সবগুলো একসঙ্গে।

গাড়িটা এগিয়ে আসছে। এবার ও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। পিছনের আকাশ আর তেমন কালো নেই। গাছের মাথা আকাশ থেকে আলগা হয়ে গেছে। তারাগুলো ফিকে হয়ে গেছে।

ও আবার উলটো দিকে ঘুরল। এবার বোধহয় গাড়িটাকে দেখা যাবে। ও এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে, কিন্তু জোরে হাঁটতে পারল না। ওর পায়ে বেশ ব্যথা। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

গাড়িটা এসে চলে গেল। একে বলে লরি। সবুজ রঙের লরি, তাতে বোঝাই করা মাল। কাত-হওয়া গাড়িটার পাশে এসে লরিটা একটু আস্তে চলল, কিন্তু থামল না।

পা টেনে টেনে ও আবার রাস্তায় পৌঁছল। এখন আলো বেড়েছে, তাই পরিষ্কার দেখল গাড়িটাকে। গাড়ির সামনেটা দুমড়ে তুবড়ে কুঁচকে আছে।

ঢাকনাটা আধখোলা হয়ে বেঁকে ভেঙে হাঁ হয়ে আছে। সামনের দরজাটা খোলা। একটা মানুষের মাথার চুল। মানুষটা চিত হয়ে আছে। তার মাথাটা খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। মাথার নিচে রাস্তাটা ভিজে।

গাড়ির পিছনেও একটা লোক। তার শুধু হাঁটুটা দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। তার প্যান্টের রঙ কালো। গাড়িটার রঙ হালকা নীল। গাড়ির আশেপাশে রাস্তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঁচ। টুকরো টুকরো কাঁচে টুকরো টুকরো আকাশ। আকাশে এখন আলো।

ঝিঁঝি ডাকছে না। একটা পাখি ডাকল। তিনবার ডাকল। সরু শিসের মতো ডাক।

ও আবার গাড়িটাকে দেখে ভয় পেল। রাস্তায় কাঁচ আর লাল দেখে ভয় পেল। লাল আর কোথাও নেই। হ্যাঁ, আছে। ওর জামায় আছে, হাতে আছে, মোজায় আছে। ও আর থাকবে না এখানে। ওই যে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। দূরে বোধহয় বন শেষ হয়েছে, কারণ ওদিকটা অনেক খোলা।

ও এগিয়ে চলল যেদিকে বনের শেষ হয়েছে সেই দিকে। ও পারবে যেতে। ও এটা বুঝেছে যে ও খুব বেশি জখম হয়নি। জখম হয়েছে ওই দুটো লোক। কিংবা মরে গেছে। ওর নিজের মাথার ব্যথাটা যদি কমে যায়, আর কনুইয়ের কাটাটা যদি শুকিয়ে সেরে যায়, আর পা যদি খুঁড়িয়ে চলতে না হয়, তাহলে কেউ ওকে কেমন আছ জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারবে—ভালোই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ওর যে কেন কিছু মনে পড়ছে না সেটা ও বুঝতেই পারছে না। আজ এই কিছুক্ষণ আগে আকাশে তারা দেখার আগের কোনো কথাই ওর মনে নেই। এমন-কি ওর নিজের নামটাও না। ও শুধু জানে ওখানে একটা ভাঙা গাড়ি, তাতে দুটো লোক পড়ে আছে আর নড়ছে না। ও জানে এটা রাস্তা, ওটা ঘাস, ওগুলো গাছ, মাথার উপর আকাশ, আকাশের একটা দিক এখন লাল, তার মানে সূর্য উঠবে, তাহলে এটা সকাল।

ও হাঁটছে। পাখির ডাকে কান পাতা যায় না। এবার গাছগুলো চেনা যাচ্ছে। ওটা বট, ওটা আম, ওটা শিমুল, ওটা—ওটা কী? পেয়ারা না? ওই তো পেয়ারা হয়ে আছে।

পেয়ারা চিনেই ওর খিদে পেল। ও গাছটার দিকে এগিয়ে গেল রাস্তা থেকে নেমে। ভাগ্যিস পেয়ারা, ভাগ্যিস আম না। আম গাছে আম আছে, কিন্তু ও জানে ওর গায়ে ব্যথা, ও গাছে চড়তে পারবে না। পেয়ারাটা হাতের কাছে। পর পর দুটো খেল ও।

বনের শেষে রাস্তা আরেকটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। কোন্ দিকে যাবে

ও? ও জানে না। শেষে না ভেবে ডাইনে ঘুরে কিছুদূর গিয়ে আর না পেরে ও একটা নাম-না-জানা গাছের নিচে বসে পড়ল। গাছের গুঁড়িতে সাদা-কালো ডোরা কাটা। শুধু এ গাছটায় নয়, রাস্তার দু'দিকে যত দূরে যত গাছ দেখা যায় সবটাতে ডোরা কাটা। কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে সাদা-কালো রঙ তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না।

আর ভাবতে চায় না ও। মাথাটা আবার দপদপ করছে। আর সেই সঙ্গে বুঝতে পারল, ওর নাকটা কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এটা জোরে শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখটা জলে ভরে গেল। আর তার পরেই ওর চোখের সামনে থেকে গাছ রাস্তা সাদা-কালো হলদে-সবুজ সব মিশে মুছে হারিয়ে ফুরিয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ওর সামনে একটা মানুষের মাথা নড়ছে। দাড়িওয়ালা পাগড়িওয়ালা মানুষের মাথা। না, মানুষটা নড়ছে না, আসলে ও নিজেই নড়ছে। মানুষটা ওর গা ধরে নাড়া দিচ্ছে।

'দুধ পী লো বেটা—গরম দুধ।'

লোকটার হাতে একটা কাঁচের গেলাসে দুধ থেকে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

এবার ও বুঝল। একটা লরির পিছনে ও শুয়ে আছে। লরিতে মাল, মালের এক পাশে, যেদিকটা খুলে যায় লরির, সেইদিকে একটুখানি জায়গাতে ও একটা চাদরের উপর শুয়ে আছে। ওর গায়েও একটা চাদর, আর মাথার নিচে পুঁটলি-করা কিছু কাপড়।

লোকটার কাছ থেকে গেলাসটা নিয়ে ও উঠে বসল। লরির এক পাশে রাস্তা, অন্যদিকে একটা খাবারের দোকান। দোকানের সামনে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা, তাতে তিনজন লোক বসে চা খাচ্ছে। আরো দোকান রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। একটায় বোধহয় গাড়ি মেরামত হয়; সেখান থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ আসছে। দোকানটার সামনে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একজন শার্ট আর প্যান্ট পরা লোক রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছছে।

পাগড়ি-পরা লোকটা দোকানের দিকে চলে গিয়েছিল, আবার ওর দিকে এগিয়ে এল। ওর পিছন পিছন বেঞ্চির লোকগুলোও এগিয়ে এল।

'কেয়া নাম হ্যায় তুম্‌হারা?' পাগড়িওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল। ওর হাতে এখনো দুধের গেলাস, অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। খুব ভালো দুধ, খুব ভালো

লাগছে খেতে।

ও বলল, 'জানি না।'

'কেয়া জানি না ? তুম বাংগালী আছে ?'

ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। নিশ্চয়ই বাঙালী। এতক্ষণ অবধি ও যা ভেবেছে সবই তো বাংলাতে।

'তোমার ঘর কুথায় ? চোট লাগা ক্যায়সে ? সাথে আউর আদমি ছিল ? তারা কুথায় গেল ?'

'জানি না, আমার মনে নেই।'

'কী ব্যাপার ? ছেলেটি কে ?'

সেই কালো গাড়ির লোকটা এগিয়ে এসেছে লরির দিকে। মাথায় বেশি চুল নেই, কিন্তু বয়স বেশি না। লোকটা চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে দেখছে ওর দিকে। পাগড়িওয়ালা হিন্দিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। খুব সহজ। রাস্তার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লরিতে তুলে নিয়ে আসে। পরিচয় পেয়ে যদি দেখে কলকাতার ছেলে, তাহলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

বাঙালী ভদ্রলোক এবার আরো কাছে এলেন।

'তোমার নাম কী ?'

নামটা ভুলে গিয়ে ওর খুব মুশকিল হয়েছে। ওকে আবার জানি না বলতে হল, আর পাগড়িওয়ালা হো-হো করে হেসে উঠল। '—জানি না, জানি না ছোড়কে আউর কুছ বোলতা হি নেহি।'

'জানি না মানে কী ? ভুলে গেছ ?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক কনুইয়ের জখমটা দেখলেন।

'আর কোথায় লেগেছে ?'

ও হাঁটুর ছড়াটা দেখিয়ে দিল।

'মাথায় লেগেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখি, মাথা হেঁট করো।'

ও হেঁট করলে পর ভদ্রলোক ফোলা জায়গাটা ভালো করে দেখলেন। হাত দিতে ব্যথা লাগায় ও শিউরে উঠেছিল।

'একটু কেটেওছে বোধহয়। চুলের মধ্যে রক্ত জমে আছে মনে হচ্ছে।...তুমি নামতে পারবে ? দেখ তো—এস।'

ও হাতের গেলাস পাগড়িওয়ালাকে দিয়ে পা ঝুলিয়ে হাত বাড়াতেই ভদ্রলোক ওকে খুব সাবধানে ব্যথা না লাগিয়ে নামিয়ে নিলেন ; তারপর পাগড়িওয়ালার

সঙ্গে ভদ্রলোক কথা বলে নিলেন। খড়্গপুর আর ত্রিশ মাইল দূর। ওখানে ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওকে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে সোজা চলে যাবেন কলকাতা।

'সিধা থানা মে লে যাইয়ে', পাগড়িওয়ালা বলল। 'কুছ গড়বড় হুয়া মালুম হোতা।'

থানা যে কী জিনিস সেটা বুঝতে ওর কিছুটা সময় লাগল। তারপর পুলিশ কথাটা কানে আসতে ওর বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল। পুলিশ চোর ধরে। শাস্তি দেয়। ও চুরি করেছে বলে তো ও জানে না !

ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি চালান। সামনে ওকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। গাড়ি ছাড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই দোকান ঘরবাড়ি শেষ হয়ে গিয়ে খোলা মাঠ পড়ল। ও বুঝতে পারছিল যে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আড়চোখে ওর দিকে দেখছেন। কিছুক্ষণ পরেই উনি আবার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন।

'তুমি কলকাতায় থাক ?'

ও তাতেও বলল, 'জানি না।'

'তোমার বাপ মা ভাই বোন কারুর কথা মনে পড়ছে না ?'

'না।'

তারপর ও নিজে থেকেই রাত্তিরের ঘটনাটা বলল। ভাঙা গাড়ির কথাটা বলল। দুটো লোকের কথা বলল।

'গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলে ?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'লোকগুলো কী রকম দেখতে মনে আছে ?'

ও যা মনে আছে বলল। বাকি রাস্তা ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে রইলেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

এখন দুটো বেজেছে সেটা ও ভদ্রলোকের হাতঘড়িটা দেখে জেনে নিয়েছে। একবার ভেবেছিল ও বলবে যে ওর খিদে পেয়েছে, শুধু দুটো পেয়ারা আর এক গেলাস দুধে পেট ভরেনি ; কিন্তু সেটা আর বলার দরকার হল না। যেখানে রাস্তার ধারে খড়্গপুর ১২ কিলোমিটার লেখা পাথরটা রয়েছে, তার পাশেই একটা গাছের তলায় ভদ্রলোক গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা সাদা কাগজের বাক্স খুলে তার থেকে লুচি আর আলুর তরকারি বার করে ওকে দিলেন, আর নিজেও নিলেন। চ্যাপটা সাদা গোল জিনিসটার নাম যে লুচি সেটা ওর কিছুতেই মনে পড়ছিল না, শেষে আকাশে অনেকগুলো পাখিকে একসঙ্গে উড়তে দেখে চিল মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লুচি মনে এসে গেল।

পাথরের ফলকের নম্বর বারো থেকে কমতে কমতে দুই হবার পরেই খড়্গপুর

শহর দেখা গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'খড়গ্‌পুর এসেছ কখনো ?'

ওর খড়গ্‌পুর নামটাই মনে নেই, এসেছে কিনা জানবে কী করে ? দেখে মনে হল ও কোনোদিন এখানে আসেনি। ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে একটা বড় ইস্কুল আছে, তাকে বলে আই আই টি।'

আই আই টি কথাটা ওর মাথার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে শহরের শব্দ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল।

একটা চৌমাথায় একটা পুলিশ দেখেই ওর বুকটা আবার কেঁপে উঠল, আর ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'আমার পুলিশ ভালো লাগে না।'

ভদ্রলোক রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললেন, 'পুলিশে খবর দিতেই হবে। ও নিয়ে তুমি কথা বোলো না। তুমি ভদ্রঘরের ছেলে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। তোমার বাপ-মা আছেন নিশ্চয়ই। তুমি তাঁদের ভুলে গেলেও তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে ভোলেননি। তুমি কে, সেটা জানতে হলে পুলিশের কাছে যেতেই হবে, আর তারাই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে। পুলিশ তো খারাপ নয়। পুলিশ অনেক ভালো কাজ করে।'

শংকর ফার্মেসির ডাক্তার ওর ছড়ে-যাওয়া জায়গাগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন, মাথায় বরফ লাগিয়ে দিলেন, কনুইয়ের উপর ওষুধ দিয়ে তুলো লাগিয়ে তার উপর একটা আঠাওয়ালা তাপ্পি মেরে দিলেন। এবার যিনি ওকে এনেছিলেন তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের এখানে থানাটা কোথায় ?'

ডাক্তার কিছু বলার আগেই ও বলল, 'আমি একটু বাথরুম যাব।'

'এস আমার সঙ্গে', বলে ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

ডাক্তারখানার পিছন দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা বারান্দা। সেই বারান্দার শেষ মাথায় একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু।

ও দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল। তারপর সত্যি করেই বাথরুমের কাজ সেরে আরেকটা বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এটা একটা গলি। ডাইনে গেলেই বড় রাস্তা। তার মানে ধরা পড়ার ভয়। ও বাঁয়ে ঘুরল। কোথায় যাচ্ছে জানে না, তবে পুলিশের কাছে নয় এটা ভেবেই ফুর্তি। ওর কনুইয়ের ব্যান্ডেজ, ময়লা কাপড়, রক্তের দাগ, খুঁড়িয়ে হাঁটা—এই সবের জন্যেই বোধহয় রাস্তার কিছু লোক ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না ওকে।

ও এগিয়ে চলল। ট্রেনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে।

গলিটা শেষ হতেই একটা বেশ বড় রাস্তা পড়ল। এ রাস্তায় অনেক লোক,

সবাই ব্যস্ত, কেউ ওর দিকে চাইছে না। বাঁদিকে লোহার রেলিং-এর ওপারে রেলের লাইন। অনেকগুলো পাশাপাশি লাইন ; তার মধ্যে একটাতে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে খুব জোরে আর কাছে। সামনে লাইনের পাশে একটা লোহার ডাণ্ডার মাথায় অনেকগুলো আড়াআড়ি ছোট ডাণ্ডা, তাদের গায়ে লাল-সবুজ গোল গোল আলো। কী যেন বলে ওগুলোকে ? ওর মনে পড়ল না।

ওই যে সামনে স্টেশন। বেশ বড় স্টেশন। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড়।

ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। ভোঁ বেজে উঠল ইঞ্জিনের দিক থেকে। ওর মনটা ছটফটিয়ে বলে উঠল—তোমাকে উঠতে হবে এই গাড়িতে। এই সুযোগ। এই বেলা উঠে পড়ো!

ওর সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে লোক ছুটোছুটি করছে। পিছন থেকে একটা পুঁটলির ধাক্কায় ও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কোনো রকমে সামলে এগিয়ে গিয়েই দেখল ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গাড়িগুলো সরে সরে যাচ্ছে ওর সামনে দিয়ে। ও আরো এগোল। সব দরজা বন্ধ। খোলা দরজা না পেলে ও উঠবে কী করে ?

ওই একটা দরজা খোলা। ও কি পারবে উঠতে ? পারবে না। ওর হাতে জোর নেই। পায়ে জোর নেই। তবু মন বলছে এই সুযোগ, এগিয়ে যাও।

ও এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে দিল। ওই যে দরজা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে। তারপর হাতল ধরে লাফ। পা হড়কালেই ফসকে গিয়ে একেবারে—

ওর পা আর মাটিতে নেই। পা ফসকায়নি। একটা হাত কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ওর কোমর জাপটে ধরে হুশ করে ওকে কামরায় তুলে নিল। আর তার পরেই শুনল ও ধমক—

'ইয়ার্কি হচ্ছে ? মারব নাকি ল্যাঙা ঠ্যাঙে ঠ্যাঙার বাড়ি ?'

॥ ৩ ॥

ও এখন বেঞ্চিতে বসে হাঁপাচ্ছে। এত জোরে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে যে কথা বলতে চাইলেও পারবে না। ও লোকটার দিকে চেয়ে আছে। ধমক দিলে কী হবে—মুখ দেখে মনে হয় না খুব বেশি রাগ করেছে। কিংবা হয়তো প্রথমে রেগেছিল, এখন ওকে ভালো করে দেখে রাগটা কমে গেছে। এখন ওর চোখে চালাক হাসি, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতগুলোতে রোদ পড়ে হাসি আরো খোলতাই

হয়েছে। দেখে মনে হয় লোকটার মাথায় হাজার বুদ্ধি কিলবিল করে, আর সেগুলো খাটিয়ে সারাটা জীবন সে চালিয়ে দিতে পারে।

কামরায় আরো লোক রয়েছে, কিন্তু ওদের বেঞ্চিতে কেবল ওরা দু'জন। সামনের বেঞ্চিতে তিনজন বুড়ো পাশাপাশি বসে আছে। একজন বসে বসেই ঘুমোচ্ছে, একজন এইমাত্র এক চিমটে কালো গুঁড়ো নিয়ে নাকের ফুটোর সামনে ধরে হাতটাকে ঝাঁকি দিয়ে নিশ্বাস টেনে নিল। আরেকজন খবরের কাগজ পড়ছে। ট্রেনের দুলুনি যত বাড়ছে তাকে তত বেশি শক্ত করে কাগজটাকে ধরে চোখের কাছে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

'এবার বলো তো চাঁদ, মতলবখানা কী?'

লোকটার গলা গম্ভীর কিন্তু হাসিটা এখনো যায়নি। সে এমনভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে যেন চাহনির জোরেই ওর মনের সব কথা জেনে যাবে।

ও চুপ করে রইল। মতলব তো পুলিশের কাছ থেকে পালানো; কিন্তু সেটা ও বলতে পারল না।

'পুলিশ?'—ওর মনের কথা জেনে তাক্ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'চালের ব্যাপার?'—লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল। এই নিয়ে পর পর তিনটে প্রশ্ন করল যার একটারও উত্তর ও দেয়নি।

'উহু। তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে। চালের থলি কাঁধে নিয়ে ছুটবে এমন তাগদ নেই তোমার।'

ও এখনো চুপ করে আছে। লোকটাও ওর দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে।

'পেটে বোমা মারতে হবে নাকি?'—এবার বলল লোকটা। তারপর কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আমাকে বলতে কী? আমি কাউকে বলব না। আমিও ঘর-পালানো ছেলে, তোমার মতন।'

ও জানত যে এবার লোকটা ওর নাম জিজ্ঞেস করবে, তাই ও উলটে ওকেই ওর নাম জিজ্ঞেস করে ফেলল। লোকটা বলল, 'আমার নামটা পরে হবে, আগে তোমারটা শুনি।'

বার বার জানি না বলতে ওর মোটেই ভালো লাগছিল না। খড়গ্‌পুর ডাক্তারখানার উলটো দিকে একটা দোকানের দরজার উপরে ও একটুক্ষণ আগেই একটা নাম দেখেছে। সাদা টিনের বোর্ডে কালো দিয়ে লেখা—'মহামায়া স্টোরস', আর তার নিচে 'প্রোঃ ফটিকচন্দ্র পাল'। ও তাই ফস্ করে বলে দিল—'ফটিক'।

'ডাকনাম না ভালো নাম?'

'ভালো নাম।'

'পদবী কী?'

'পদবী?'

পদবী কথাটার মানের জন্য ওর কিছুক্ষণ মাথার মধ্যে হাতড়াতে হল।

'পদবী বোঝ না?'—লোকটা বলল। 'তুমি কি সাহেব ইস্কুলে পড় নাকি? সারনেম। সারনেম বোঝ?'

সারনেম ও আরোই বোঝে না।

'নামের শেষে যেটা থাকে', লোকটা ধমক দিয়ে বলল। 'যেমন রবির শেষে ঠাকুর।...তুমি সত্যিই বোকা, না বোকা সেজে রয়েচ সেটা আমাকে জানতে হবে।'

নামের শেষে বলাতেই ও বুঝে ফেলেছে। বলল, 'পাল। পদবী পাল। আর মাঝখানে চন্দ্র। ফটিকচন্দ্র পাল।'

লোকটা একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যে লোকটা ঝড়াকসে নিজের একটা নাম বানিয়ে বলতে পারে সেও আর্টিস্ট। এসো, হারুনের সঙ্গে হাত মেলাও ফটিকচাঁদ পাল। হারুন, মাঝখানে অল, শেষে রসিদ। বোগ্‌দাদের খলিফ, জগ্‌লরের বাদশা।'

ও হাতটা বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু লোকটা ওর বানানো নাম বিশ্বাস করল না বলে ওর একটু রাগ হল।

'তুমি যে-বাড়ির ছেলে', লোকটা সটান ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেসব বাড়ি থেকে ফটিক নামটা উঠে গেছে সিরাজদ্দৌলার আমল থেকে।—দেখি তোমার হাতের তেলো।'

ও কিছু বলার আগেই লোকটা ওর ডান হাতটা খপ্ করে তেলোটা দেখে নিয়ে বলল, 'হুঁ...বাসের রড ধরে ঝুলতে হয়নি কস্মিনকালেও।...শার্টের দাম কম-সে-কম ফর্টিফাইভ চিপ্‌স...টেরিকটের প্যান্ট..নো মাদুলি...লাস্ট টিকেটা উঠেছিল কি? হুঁ...সেলুনে ছাঁটা চুল, খুব বেশিদিন না...পার্কিস্ট্রীটের সেলুন কি? তাই তো মনে হচ্ছে?...'

লোকটা আবার চেয়ে আছে ওর দিকে; হয়তো চাইছে ও কিছু বলুক। ও বাধ্য হয়েই বলল, 'আমার কিচ্ছু মনে নেই।'

লোকটার চোখ দুটো হঠাৎ খুদে খুদে আর জ্বলজ্বলে হয়ে গেল।

'বোগ্‌দাদের খলিফের সঙ্গে ফচকেমো করতে এসো না চাঁদ। ওসব কারচুপি খাটবে না আমার কাছে। তুমি অনেক ভাজা মাছ উলটে খেয়েচো। সাহেবী ইস্কুলের তালিম তোমার, হুঁ-হুঁ! ব্যাড কোম্পানি হয়ে এখন বাপের খপ্পর থেকে ছটকে বেরিয়ে এসেচ। আমি কি আর বুঝি না? কনুইয়ে চোট লাগল কী করে? মাথা ফুলেচে কেন? ল্যাংচাচ্চ কেন? যা বলবার সাফ বলে ফেল তো

চাঁদ ! নইলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দোব জকপুরে গাড়ি থামলেই। ...বল, বলে ফেল।'

ও বলল। সব বলল। ওর মনে হল একে বলা যায়। এ লোকটা ক্ষতি করবে না ওর, ওকে পুলিশে দেবে না। আকাশে তারা দেখা থেকে আরম্ভ করে বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব বলল।

লোকটা শুনে-টুনে কিছুক্ষণ চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরের চলন্ত মাঠঘাটের দিকে চেয়ে ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার তো তাহলে একটা ডেরা লাগবে কলকাতায়। আমি যেখানে থাকি সেখানে তো তোমার থাকা পোষাবে না।'

'তুমি কলকাতায় থাক ?'

'আগে থেকেচি। এখন আবার থাকব। ডেরা একটা আছে আমার এনটালিতে। মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরতে বেরোই বাক্স নিয়ে। রথের মেলা, চড়কের মেলা, শিবরাত্তিরের মেলা। বিয়েশাদিতেও বায়না জুটে যায় টাইম টু টাইম। এখন আসচি কোয়েম্বাটোর থেকে। কোয়েম্বাটোর জান ? মাদ্রাজে। তিন হপ্তা স্রেফ ইডলি-দোসা। এক সার্কাস কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে এসেচি। ভেঙ্কটেশ ট্রাপীজ দেখায় গ্রেট ডায়মন্ডে, আমার সঙ্গে দোস্তি হয়েচে। বলেচে চান্স হলেই জানাবে। আপাতত কলকাতা। শহীদ মিনারের নিচে ঘাসের উপর একফালি জায়গা, ব্যস্।'

'তুমি ঘাসের উপর থাকবে ?' ও জিজ্ঞেস করল। ও নিজে অনেকক্ষণ ঘাসের উপর শুয়ে ছিল সেটা ওর মনে আছে।

লোকটা বলল, 'থাকব না, খেল দেখাব। ওই যে বেঞ্চির নিচে বাক্সটা দেখছ, ওর মধ্যে আমার খেলার জিনিস আছে। জাগ্‌লিং-এর খেলা। একটি জিনিসও আমার নিজের কেনা নয়। সব ওস্তাদের দেওয়া।'—ওস্তাদ কথাটা বলেই লোকটা তিনবার কপালে হাত ঠেকাল। —'তিয়াত্তর বছর বয়স অবধি খেল দেখিয়েছিল। তখনও চিরুনি দিয়ে দু' ভাগ করে আঁচড়ানো দাড়ির অর্ধেক কাঁচা। নমাজ পড়ার মতো করে বসে লাট্টু ছুঁড়েচে আকাশে, তারপর তেলোটা চিত করে হাতটা বাড়িয়েছে ধরবে বলে—হঠাৎ দেখি ওস্তাদ হাত টেনে নিয়ে দু' হাত দিয়ে বুক চেপে দুমড়ে গেল। লাট্টু আকাশ থেকে নেমে এসে ওস্তাদের পিঠের দুই পাখনার মধ্যিখানে শিরদাঁড়ার উপর পড়ে ঘুরতে লাগল—পাবলিক ক্ল্যাপ দিচ্ছে, ভাবছে বুঝি নতুন খেলা—কিন্তু ওস্তাদ আর সোজা হলেন না।'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে থেকে বোধ হয় ওস্তাদের কথাই ভাবল। তারপর বলল, 'উপেনদাকে বলে দেখব, যদি তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারেন। অবিশ্যি পুলিশ লাগবে তোমার পেছনে সেটা বলে

দিলাম।'

ওর মুখ আবার শুকিয়ে গেল। লোকটা বলল, 'নিয়মমতো তোমাকে আমার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।'

'না-না !'—ও এবার বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

'ভয় নেই', লোকটা একটু হেসে বলল, 'আর্টিস্টের নিয়মগুলো একটু আলাদা। নিয়ম যদি মানতাম গোড়া থেকেই, তাহলে তোমার সঙ্গে আজ এইভাবে থার্ড কেলাসে বসে কথা বলতে হত না। নিয়ম মানলে এই আপিস ভাঙার টাইমে অরুণ মুস্তাফি হয়তো ফিয়াট গাড়ি হাঁকিয়ে বি বি ডি বাগ থেকে বালিগঞ্জে ফিরত।'

একটা লোকের নাম ওর মাথায় ঘুরছিল। ও জিজ্ঞেস করল, 'উপেনদা কে ?'

লোকটা বলল, 'উপেনদা হল উপেন গুঁই। বেনটিং ইস্ট্রীটে চায়ের দোকান আছে।'

'হিল্লে কাকে বলে ?'

'হিল্লে মানে গতি। যাকে বলে ব্যবস্থা। —তুমি নিঘ্‌ঘাৎ সাহেব ইস্কুলে পড়েছ।'

॥ ৪ ॥

দারোগা দীনেশ চন্দ আরেকবার রুমালটা বার করে কপালের ঘামটা মুছে একটা কেঠো হাসি হেসে বললেন, 'আপনি অতটা ইয়ে হবেন না স্যার। আমরা তো অনুসন্ধান চালিয়েই যাচ্ছি। আমরা—'

'মুণ্ডু !'—হেঁকে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। 'আমার ছেলে কী অবস্থায় আছে সেটাই বলতে পারছেন না আপনারা !'

'মানে, ব্যাপারটা—'

'আপনি থামুন। আমাকে বলতে দিন। আমি আপনাদের কথাই বলছি। —চারজন লোক, এ গ্যাঙ অফ ফোর, বাবলুকে কিডন্যাপ করেছিল। তারা একটা নীল রঙের চোরাই অ্যামবাসাডরে করে ওকে নিয়ে ঘাটশিলা ছাড়িয়ে সিংভূমের দিকে যাচ্ছিল।'

'ইয়েস স্যার।'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করার দরকার নেই, আমাকে শেষ করতে দিন। ...পথে একটা লরি ওদের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালায়। মাঝরাত্তিরে। লরিটাকে পরে আপনারা ধরেছেন।'

'ইয়েস—' দারোগা সাহেব স্যারের আগে ব্রেক কষে নিজেকে কোনোমতে সামলে নিলেন।

'অ্যাকসিডেন্টে দু'জন লোক মারা যায়। সেই চারজনের মধ্যে দু'জন।'

'বঙ্কু ঘোষ আর নারায়ণ কর্মকার।'

'কিন্তু দলের পাণ্ডা বেঁচে আছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী নাম তার ?'

'তার আসল নামটা ঠিক জানা নেই।'

'চমৎকার।—কী নামে জানেন তাকে ?'

'স্যামসন।'

'আর অন্যটি ?'

'রঘুনাথ।'

'এও ছদ্মনাম ?'

'হতে পারে।'

'যাক্‌গে।...স্যামসন আর রঘুনাথ বলছেন বেঁচে আছে—অ্যাকসিডেন্টের পরে তারা পালায়। আর আপনারা বলছেন, বাবলু গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে।—'

'আজ্ঞে, দশ-বারো বছরের ছেলের সাইজের একটা জুতোর সোলের খানিকটা পাওয়া গেছে গাড়ি থেকে সাত হাত দূরে। রাস্তার পাশটা খানিকটা ঢালু হয়ে জঙ্গলের দিকে নেমে গেছে, সেই স্লোপের নিচের দিকে। তাছাড়া রক্তের দাগও পাওয়া গেছে তার আশেপাশে। আর একটি নতুন ক্যাডবেরি চকোলেটের প্যাকেট।'

'কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।'

'না স্যার।'

'জঙ্গলের ভিতর সার্চ করা হয়েছে ? নাকি বাঘের ভয়ে সেটা বাদ গেছে ?'

দারোগাবাবু হালকাভাবে হাসতে গিয়ে না পেরে কেশে বললেন, 'ও জঙ্গলে বাঘ নেই স্যার। জঙ্গলে তো সার্চ করেইছি, এমন-কি কাছাকাছির গ্রাম ক'টাও বাদ দিইনি।'

'তাহলে আপনারা কী রিপোর্ট করতে এসেছেন আমার কাছে ? সমস্ত ব্যাপারটা তো জলের মতো পরিষ্কার। স্যামসন আর রঘুনাথ বাবলুকে নিয়েই পালিয়েছে।'

দারোগা হাত তুলে মিস্টার সান্যালের কথা বন্ধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে করে হাতটা নামিয়ে বললেন, 'একটা আশার আলো দেখা গেছে,

সেইটেই আপনাকে—'

'ওসব আলো-টালো থিয়েটারি বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলুন।'

দারোগাবাবু আরেকবার কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, 'অমরনাথ ব্যানার্জি বলে এক ভদ্রলোক—জুট কর্পোরেশনে কাজ করেন—ঘাটশিলা থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মোটরে করে ওই অ্যাকসিডেন্টের পরের দিন। উনি ঘাটশিলায় বাড়ি করেছেন ; বৌ আর ছেলেকে—'

'ফ্যাকড়া বাদ দিন।'

'হ্যাঁ স্যার, সরি স্যার।—খড়গ্‌পুর থেকে ত্রিশ মাইল আগে একটা লরিতে একটি ছেলেকে দেখেন। তার হাতে পায়ে ইনজুরি ছিল। লরির ড্রাইভার বলে ছেলেটিকে নাকি রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে পায়, অ্যাকসিডেন্টের জায়গা থেকে মাইলখানেক উত্তরে, মেন রোডে। ভদ্রলোক ছেলেটিকে নিয়ে খড়গ্‌পুরে একটা ডাক্তারখানায় যান। সেখানে ফার্স্ট এড দেবার পর ছেলেটি বাথরুমে যাবার নাম করে পালায়। ভদ্রলোক পুলিশে রিপোর্ট করেন।'

দারোগাবাবু থামলেন। মিস্টার সান্যাল এতক্ষণ তাঁর কাঁচের ছাউনি দেওয়া প্রকাণ্ড টেবিলটার উপর দৃষ্টি রেখে ভুরু কুঁচকে কথাগুলো শুনছিলেন, এবার দারোগাবাবুর দিকে চোখ তুলে বললেন, 'এত কথা বললেন, আর ছেলেটিকে তার নামটা বলেছে কিনা বললেন না ?'

'ওইখানে একটা মুশকিল হয়েছে স্যার। ছেলেটির বোধহয় লস্‌ অফ মেমরি হয়েছে।'

'লস্‌ অফ মেমরি ?'—অবিশ্বাসে মিস্টার সান্যালের নাক চোখ ভুরু সব একসঙ্গে কুঁচকে গেল।

'সে নিজের নাম, আপনার নাম, কোথায় থাকে, কিচ্ছু নাকি বলতে পারেনি।'

'ননসেন্স !'

'অথচ চেহারার বর্ণনায় দস্তুরমতো মিল আছে !'

'কী-রকম ? রঙ ফরসা, দোহারা চেহারা, চুল কোঁকড়া—এই তো ?'

'আজ্ঞে নীল প্যান্ট আর সাদা শার্টের কথাও বলেছে।'

'আর কোমরে জন্মদাগ বলেছে ? থুতনির নিচে তিলের কথা বলেছে ?'

'না স্যার।'

মিস্টার সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর হাতঘড়িটার দিকে দেখে বললেন, 'আজকে আমাকে কোর্টে যেতেই হবে। এ তিনদিন পারিনি দুশ্চিন্তায়। আমার তিন ছেলেকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। একটি আবার খড়গ্‌পুরে আছে—আই আই টি-তে। ফোন করেছিল—আজই আসবে। অন্য দুটি বম্বে আর ব্যাঙ্গালোরে। আসবে নিশ্চয়ই, হয়তো দু-একদিন দেরি হবে।

চিন্তা সবচেয়ে বেশি মাকে নিয়ে। বাবলুর মা নয়, আমার মা। বাবলুর মা বেঁচে থাকলে এ শক্ সইতে পারত না। আমি রাস্তা ঠিক করে ফেলেছি। ওই লোক দুটো যদি বাবলুকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে টাকা ডিমান্ড করবেই। যদি করে তো আমি সে টাকা দেব, দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেব। তারপর তারা ধরা পড়ল কি না-পড়ল, সেটা আপনাদের লুক-আউট, আই ডোন্ট কেয়ার।'

কথাটা বলে কলকাতার জাঁদরেল ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁর তিনদিক-বইয়ে-ঠাসা আপিস-ঘরের শ্বেতপাথরের মেঝেতে জুতোর আওয়াজ তুলে দারোগা দীনেশ চন্দের কপালে নতুন করে ঘাম ছুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৫ ॥

উত্তর কলকাতার একটা অখ্যাত চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানে (প্রোঃ নরহরি দত্তরায়) দুটি লোক ঢুকে দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসে বিশ মিনিটের মধ্যে নিজেদের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে নিল। যে বেশি জোয়ান আর বেশি লম্বা, যার কাঁধ দুটো ধরে পরেশ নাপিত চমকে উঠেছিল, তার ছিল চাপদাড়ি আর গোঁফ আর মাথায় কাঁধ অবধি চুল। তার দাড়িগোঁফ বেমালুম সাফ হয়ে গেল, তার মাথার চুল হয়ে গেল দশ বছর আগে বেশির ভাগ লোক যে-রকম চুল রাখত সেইরকম। অন্য লোকটির ঝুলপি বাদ হয়ে গেল, সিঁথি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের জায়গায় রয়ে গেল শুধু একটা সরু গোঁফ। পরেশ আর পশুপতি তাদের পাওনার উপরি পেল ষণ্ডা লোকটার কাছ থেকে এমন একটা মুখ-বন্ধ-করা চাহনি যেটা তারা কোনোদিন অমান্য করতে পারবে না।

চুল ছাঁটার বিশ মিনিট পরে লোক দুটি শোভাবাজারের একটা গলিতে একটা ঘুণধরা একতলা বাড়ির কড়া নাড়ল। দরজা খুললেন একজন বেঁটে শুকনো বুড়ো ভদ্রলোক। ষণ্ডা লোকটি তাঁর বুকের উপর পাঁচটা আঙুলের ডগার চাপ দিয়ে তাঁকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে গেল, আর সেইসঙ্গে অন্য লোকটাও ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সময়টা সন্ধ্যা, ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা বিশ পাওয়ারের বাল্‌ব।

'চিনতে পারছ দাদু?'—বলল ষণ্ডা লোকটা বুড়োর উপর ঝুঁকে পড়ে।

বুড়োর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মাথার কাঁপুনির চোটে ইস্পাতের ফ্রেমের আদ্যিকালের চশমাটা নাকের উপর নেমে আসছে।

'কই-কে-কই না তো...'

ষণ্ডা লোকটা একটা বিশ্রী হাসি হেসে বলল, 'দাড়ি কামিয়েছি যে!—এই

দ্যাখো—'

লোকটা বুড়োর মাথাটা টেনে এনে চশমাসুদ্ধু নাকটা নিজের গালে ঘষে দিল।

'গন্ধ পাচ্ছ না দাদু? শেভিং সোপের খুশবু? আমার নাম যে স্যামসন। এবার মনে পড়ছে?'

বৃদ্ধ এবার কাঁপতে কাঁপতে তক্তপোশে বসে পড়লেন, কারণ লোকটা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

'তোমার হুঁকো খাবার সময় ডিসটার্ব দিলুম—ভেরি সরি দাদু!'

স্যামসন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হুঁকোটাকে তুলে নিয়ে কলকেটা মাথা থেকে খুলে নিল। তক্তপোশের উপর একটা ডেস্ক, তার উপর একটা খোলা পাঁজি। পাঁজির পাতার উপর চাপা দেওয়া একটা ছ'কোনা পাথরের পেপারওয়েট। স্যামসন পেপারওয়েটটা সরিয়ে কলকেটা পাঁজির উপর ধরে উপুড় করতেই টিকেগুলো পাঁজির পাতার উপর পড়ল। তারপর কলকেটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার টেনে নিয়ে তক্তপোশের সামনে বুড়োর মুখোমুখি বসে বলল, 'এবার বল তো দিকি দাদু—গাঁট যদি কাটার ইচ্ছে থাকে তো সোজাসুজি কাটতেই হয়; গনৎকারীর ভড়ং ধরেচ কেন?'

বুড়ো কোন্‌দিকে চাইবেন বুঝতে পারছেন না। পাঁজির পাতা থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে ঘরটার কড়িবরগার দিকে, পাতায় কালশিটে পড়ে গর্ত হয়ে যাচ্ছে, তামাকের গন্ধের সঙ্গে পোড়া কাগজের গন্ধ মিশে যাচ্ছে।

স্যামসন তার ঝাঁঝালো ফিসফিসে গলায় বলে চলল, 'সেদিন যে এলুম—এসে বললুম একটা বড় কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, একটা ভালো দিন দেখে দাও। তুমি বই দেখে হিসেব করে বললে আষাঢ়ের সাতুই। লোকে বলে বাড়ির আলসেতে কাগ এসে বসলে ভৈরব ভট্‌চায তার ভাগ্য গুনে দিতে পারে। আমরাও বিশ্বাস করে এলুম, তুমি বলে-টলে গাঁট থেকে দশটি টাকা বার করে নিয়ে তোমার ওই কাঠের বাক্সের মধ্যে গুঁজে রেখে দিলে। তারপর কী হয়েচে জান?'

গনৎকার মশাই পাঁজি থেকে চোখ সরাতে পারছেন না বলেই বোধহয় রঘুনাথ লোকটি তাঁর থুতনি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে স্যামসনের দিকে করে দিল। আর সেইসঙ্গে দুটো চোখের পাতাও আঙুল দিয়ে টেনে খুলে রাখল, যাতে ভট্‌চায মশাই স্যামসনের মুখ থেকে চোখ সরাতে না পারেন। চোখের ব্যাপারটা করার আগে অবিশ্যি রঘুনাথ ভট্‌চাযের চশমাটি খুলে তক্তপোশের উপর ফেলে দিয়েছিল।

'বলছি শোন', বলল স্যামসন, 'যে গাড়িতে করে মাল নিয়ে যাচ্ছিলাম, এক শালা লরি তাতে মারে ধাক্কা। গাড়ি খোলামকুচি। লরি ভাগলওয়া। দো পার্টনার খতম। স্পট ডেড। আমার লোহার শরীর, তাই জানে বেঁচে গেছি। তাও মালাইচাকি ডিসলোকেট হতে হতে হয়নি। আর এই যে—এ আমার পার্টনার—এর তিনি জায়গা জখম, ডান পাশে ফিরে ঘুমুতে পাচ্চে না! ওদিকে যার জন্যে এত মেহনত—সে মালটিও খতম।...এসব তুমি গুনে পাওনি কেন?'

'আমরা তো বাবা ভগবান—'

'চ্যাওপ্!'

রঘুনার বুড়োর মাথাটা ছেড়ে তাকে খানিকটা রেহাই দিল, কারণ বাকি খেলাটা স্যামসন একাই খেলবে।

'এবার বার করো তো দেখি দাদু দশ ইনটু দশ।'

'আ-আমি—'

'চ্যাওপ্!'

স্যামসনের চাপা চিৎকারের সঙ্গে তার হাতে একটা ছুরি এসে গেল, আর তার ভাঁজ-করা অদৃশ্য ফলাটা হাতলে একটা বোতাম টেপার ফলে সড়াৎ শব্দে খুলে গেল।

ছুরিসমেত হাতটা গনৎকারের দিকে এগিয়ে এল।

'দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি।'

ভৈরব জ্যোতিষীর থরথরে হাত প্রথমে তাঁর ট্যাঁক, তারপর তাঁর তেলচিটে-পড়া কাঠের ক্যাশবাক্সটার দিকে এগিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

এই পাঁচ দিনে ফটিক তার কাজ বেশ কিছুটা শিখে নিয়েছে। উপেনবাবু লোক ভালো হওয়াতে অবিশ্যি খুব সুবিধে হয়েছে। তিনি ফটিককে বারো টাকা মাইনে, থাকার জায়গা, আর খেতে দেবেন। এস মাসের মাইনে আগাম দিয়েছেন। উপেনবাবু যে লোক ভালো, সেটা ফটিক সত্যি করে বুঝেছে গতকাল। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে উপেনবাবুর জন্য পান আনতে গিয়ে বিশু বলে আরেকটা পানের দোকানের ছেলের সঙ্গে ফটিকের আলাপ হয়। বিশুও সবে মাসখানেক হল কাজে ঢুকেছে। ঢোকার দু'দিনের মধ্যে সে একটা চায়ের কাপ ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার একগোছা চুল মালিক বেণীবাবুর হাতে উঠে আসে, আর তার পরেই এক রাবুণে গাঁট্টার চোটে মাথায় আলু বেরিয়ে যায়।

উপেনবাবু মারেন না। তিনি ধমক দেন, আর ধমকটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, আর ক্রমে সেটা বদলে গিয়ে একঘেয়ে উপদেশ হয়ে যায়। এই উপদেশটা খেপে খেপে দিনের শেষ অবধি চলতে থাকে। দ্বিতীয় দিনে ফটিক যখন কাঁচের গেলাসটা ভাঙল, তখন উপেনবাবু প্রথমে মেঝেতে ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ফটিক যখন টুকরোগুলো গামছায় তুলছে, তখন তিনি মুখ খুললেন।—

'কাঁচের জিনিসটা যে ভাঙলে, কিনতে পয়সা লাগে না? পয়সাটা দিচ্ছে কে? তুমি না আমি? এসব কথাগুলো কাজের সময় খেয়াল রেখো। কাজে ফুর্তি চাই ঠিকই, তার মানে এই নয় যে, হাতে গেলাস নিয়ে লাফাতে হবে। দোকানের জিনিসপত্তর হাতে নিয়ে ভোজবাজি করার জিনিস নয়।'

উপদেশের কথাগুলো যে উপেনবাবু ঠিক শোনাবার জন্য বলেন তা নয়। দোকানের গোলমালের মধ্যেই ফটিক লক্ষ করেছিল ওঁর ভুরু কুঁচকানো আর ঠোঁট দুটো নড়ছে। খদ্দেরের অর্ডার নিয়ে ওদিকে যেতে ওঁর দু-একটা কথা ফটিকের কানে এসে গেছিল। উপদেশ দেবার সময় উপেনবাবু কাজ থামান না, এটা ফটিক লক্ষ করেছে।

দোকানে নতুন মুখ যে রোজ দেখা যায় তা নয়। বেশির ভাগই যারা আসে তারা রোজই আসে, আর তাদের খাবার সময়টা বাঁধা। শুধু সময় না, অর্ডারটাও বাঁধা। কেউ শুধু চা, কেউ চা-টোস্ট, কেউ চা-ডিম-টোস্ট—এইরকম আর কি। ডিম মানে হয় ডিম পোচ, না-হয় ডিমের মামলেট। কে কী অর্ডার দেয়, সেটা ফটিক এর মধ্যেই বুঝে ফেলতে শুরু করেছে। আজ সকালে সেই রোগা লিকলিকে লোকটা—যে ভীষণ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে থাকে—সে এসে তিন নম্বর টেবিলে বসতেই ফটিক তার কাছে গিয়ে বলল, 'চা আর মাখন-ছাড়া টোস্ট?' লোকটা সেইরকমই দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল, 'চিনে ফেলেছিস এর মধ্যেই?'

লোক চিনে রাখার মধ্যে ফটিক একটা বেশ মজা পেয়ে গেছে। তবে একটু সাবধানে চলতে হবে, কারণ আজই দুপুরে ও একটা ভুল করে বসেছিল। একজন হলদে শার্টপরা মোটা লোককে দেখে চেনা মনে করে যেই বলেছে, 'চা আর ডবল ডিমের মামলেট?'—অমনি লোকটা হাতের খবরের কাগজ সরিয়ে ফটিকের দিকে ভুরু তুলে বলল, 'তোর মর্জিমাফিক খেতে হবে নাকি?'

যেটা ফটিকের সবচেয়ে ভালো লাগছে সেটা হল যে, কাপ-ডিস নিয়ে চলাফেরাটা ওর ক্রমে সহজ হয়ে আসছে। হারুনদা বলেছিল, 'দেখবি এসব আস্তে আস্তে কেমন সড়গড় হয়ে আসবে। তখন দেখবি কাজটা একেবারে নাচের ছকে বাঁধা হয়ে গেছে। আসলে এটাও একটা আর্ট। সেই আর্টটা যদ্দিন রপ্ত না হচ্ছে, তদ্দিন মাঝে মাঝে দু-একটা করে জিনিসপত্তর ভাঙবেই।'

হারুনদা রোজই বিকেলে একবার আসে। উপেনবাবুকে অবিশ্যি আসল ব্যাপার কিছু বলেনি। ফটিক হয়ে গেছে হারুনের দূর সম্পর্কের ভাই, মেদিনীপুরে থাকে, বাপ-মা কেউ নেই, এক খিটখিটে খুড়ো আছে যে গাঁজা খায় আর ফটিককে ধরে বেধড়ক মারে।—'দেখছেন উপেনদা—লোকটা স্রেফ খামচে দিয়ে কনুইয়ের ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছে। মাথায় ফোলাটা দেখছেন ?—চ্যালাকাঠের বাড়ি।' উপেনবাবুও এক কথায় রাজী। যে ছেলেটি আছে তাকে নাকি আর রাখা যাচ্ছে না। সে নাকি পর পর তিনদিন ফাঁকি দিয়ে হিন্দি ফিলিম দেখতে গিয়ে রাত করে ফিরে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে দোষ ঢাকতে গিয়েছিল।

ফটিকের চেহারার বদল হয়েছে। তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কাটিয়ে ছোট করে দিয়েছে হারুনদা। তাতে অবিশ্যি ফটিক কোনো আপত্তি করেনি। চুল ছাঁটার পরে হারুনদা যখন ওকে এক জোড়া নতুন হাফপ্যান্ট, দুটো শার্ট, দুটো হাতকাটা গেঞ্জি আর এক জোড়া চটি কিনে দিয়ে বলল, 'কাজের সময় গেঞ্জি পরবি, তবে পরার আগে একটু চায়ের জলে চুবিয়ে শুকিয়ে নিবি'—তখন ফটিকের হঠাৎ কেন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। বোধহয় কাজ কথাটা শুনে নিজেকে বড় মনে হওয়ার জন্যেই। কাজটা তার অভ্যেস হয়ে যাবে এটা ফটিক জানে। সকাল সাড়ে-আটটা থেকে রাত আটটা অবধি হপ্তায় পাঁচ দিন। শনিবার চারটে অবধি, আর রবিবার ছুটি। দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে উপেনবাবুর ছোট কাঠের ঘর, আর সেই ঘরের দরজার বাইরে টিনের ছাউনির তলায় ফটিকের নিজের শোবার জায়গা। প্রথম রাত মশার কামড়ে ঘুম হয়নি, তাই চাদরটা পা থেকে মাথা অবধি জড়িয়ে নিয়েছিল, কিন্তু নিশ্বাসের কষ্ট হওয়াতে বেশিক্ষণ সেভাবে থাকতে পারেনি। পরদিন উপেনবাবুকে বলাতে উনি একটা মশারি এনে দিলেন। তারপর থেকে ঘুম ভালোই হচ্ছে। কনুইয়ের ঘা-টা শুকিয়ে এসেছে, মাথার ব্যথাটা মাঝে মাঝে চলে যায় আবার মাঝে মাঝে ফিরে আসে। যেটা একেবারেই ফিরে আসে না সেটা হল, সেদিন সেই আকাশে তারা দেখার আগের ঘটনাগুলো। ও বুঝেছে ও নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। হারুনদাও বলেছে যে, যে-জিনিসটা নেই, যেটা শুন্যি, সেটা নিয়ে ভাবা যায় না। 'মনে পড়লে আপনিই পড়বে রে ফটিক !'

আসল মজা হয়েছিল গতকাল। গতকাল ছিল রবিবার। হারুনদা বলে দিয়েছিল, তাই ফটিক দোকানেই ছিল। হারুনদা এল দুটোর সময়, সঙ্গে কাঁধে ঝোলানো একটা থলি। অনেক রঙচঙে কাপড়ের টুকরো পাশাপাশি সেলাই করে তৈরি হয়েছে থলিটা। ফটিক হারুনের সঙ্গে উপেনবাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল শহীদ মিনার।

এ-রকম যে একটা জায়গা থাকতে পারে, সেটা ফটিক ভাবতেই পারেনি। মিনারের একটা দিকে মানুষ ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এত মানুষ এক জায়গায় এক সঙ্গে কী করতে পারে, সেটা ফটিকের মাথায় ঢুকল না। হারুন বলল, 'মিনারের চুড়োয় যদি উঠতে পারতিস তাহলে দেখতিস, এই ভিড়টার মধ্যে একটা নকশা আছে। দেখতিস ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা গোল চক্করের মতো ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকটার প্রত্যেকটাতে একটা কিছু ঘটছে, আর সেইটে দেখবার জন্য গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়েছে।'

'রোজ এত লোকের ভিড় হয় এখানে ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'ওনলি সানডে', বলল হারুন, 'চ তোকে দেখাচ্চি। দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবি।'

ফটিক দেখল বটে, কিন্তু বুঝল বললে একটু বেশি বলা হবে। এত বিরাট ব্যাপার সহজে বোঝা যায় না। এত রকম কাজ, এত রকম খেলা, এত রকম ভাষা, এত রকম রঙ আর এত রকম শব্দ এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে যে, ফটিকের চোখ-কান-মাথা সব এক সঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল। শুধু যে খেলা হচ্ছে তা তো নয়। একটা দিকে কেবল জিনিস ফেরি হচ্ছে—দাঁতের মাজন, দাদের মলম, বাতের ওষুধ, চোখের ওষুধ, নাম-না-জানা শুকিয়ে যাওয়া শেকড় বাকল, আর আরো কত কী। এক জায়গায় একটা টিয়া পাখি এক গোছা কাগজের মধ্যে থেকে একটা করে কাগজ ঠোঁট দিয়ে টেনে বার করে লোকের ভাগ্য বলে দিচ্ছে। একজন লোক কথার তুবড়ি ছেড়ে একরকম আশ্চর্য সাবানের তারিফ করছে—লোকটার মাথায় পাগড়ি, গায়ে খাকী প্যান্ট আর দু-হাতে গোলাপী সাবানের ফেনা। একদিকে একটা লোক গলায় একটা ইয়া মোটা লোহার শিকল ঝুলিয়ে হাত-পা নেড়ে কী জানি বলছে, আর তার চারদিকের লোক হাঁ করে তার কথা শুনছে। তার কাছেই একটা সিমেন্ট-বাঁধানো জায়গার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটা ভীষণ ময়লা কাপড়পরা কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া-চুলো পাগলাগোছের লোক লাল, কালো আর সাদা খড়ি দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর দেবদেবীর ছবি আঁকছে। লোক চারপাশ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পয়সা ফেলছে, সেগুলো ঠং ঠং করে হনুমানের ল্যাজে, রামচন্দ্রের মুকুটে, রাবণের মাথার উপর পড়ছে, কিন্তু লোকটা সেগুলোর দিকে দেখছেই না।

তবে এটা ফটিক দেখল যে, যেসব জিনিস হচ্ছে তার মধ্যে খেলাটাই সবচেয়ে বেশি। কেবল একটা জিনিসকে ফটিক খেলা বলবে না কী বলবে ভেবেই পেল না—ফটিকের চেয়েও কয়েক বছরের ছোট একটি ছেলে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর মাথার চারপাশে মাটি চাপা দিয়ে বাতাস ঢোকার ফাঁকটাও বন্ধ করে দিয়েছে আরেকটি

বাচ্চা ছেলে। এইভাবে ছেলেটা চিত হয়ে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। ফটিক কিছুক্ষণ দেখে ঢোক গিলে বলল, 'ও হারুনদা, ও যে মরে যাবে!'

'এখানে কেউ মরতে আসে না রে ফটকে', বলল হারুন,—'এখানে আসে বাঁচতে। ও-ও বেঁচে যাবে। ও যা করছে সেটা স্রেফ অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাসে কী যে হয় সেটা খলিফ হারুনের খেলা দেখলে বুঝবি।'

হারুন ওকে নিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেখানে ও আগে খেলা দেখাত সেই জায়গায়। সেখানে এখন একটা মেয়ে খেলা দেখাচ্ছে। দড়ির উপর ব্যালান্সের খেলা। মাটি থেকে প্রায় সাত-আট হাত উঁচুতে টান করে বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে দিব্যি এ-মাথা থেকে ও-মাথা চলে যাচ্ছে মেয়েটা। 'মাদ্রাজের মেয়ে', বলল হারুনদা।

আরেকটা জায়গায় একটা শূন্যে ঝোলানো লোহার রিং-এর গায়ে আট-দশটা জায়গায় আগুন জ্বলছে দেখে ফটিক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওর ভিতর দিয়ে একটা লোক লাফাবে বুঝি?'

হারুন হাঁটা থামিয়ে ওর দিকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোর মনে পড়ে গেছে? তুই আগে দেখেছিস এ জিনিস?'

ফটিক 'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও পারল না। একটা আলো-বাজানা-ভিড় মেশানো ছবি এক মুহূর্তের জন্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সামনে যা দেখতে পাচ্ছে তাই।

হারুন আবার এগিয়ে গেল, ফটিক তার পিছনে।

যে জায়গাটায় হারুন খেলা দেখাবে সেখানে এখন কেউ নেই। ডান দিকে একটা ভিড়ের পিছন থেকে ডুগডুগির শব্দ আসছে, ফটিক মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে ভাল্লুকের কালো লোম দেখতে পেয়েছে। ডুগডুগি আর ঢোলক এখানে সব খেলাতেই বাজায়, কিন্তু হারুন থলি থেকে যেটা বার করল সেটা দুটোর একটাও নয়। সেটা একটা বাঁশি; যেটার পিছন দিকটা সরু আর সামনের দিকটা চওড়া আর ফুলকাটা। সাতবার পর পর ফুঁ দিল বাঁশিটায় হারুনদা। ফটিক জানে যে, সব শব্দ ছাপিয়ে বাঁশির শব্দ শোনা গেছে ময়দানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা।

এবার বাঁশিটা ওয়েস্টকোটের পকেটে রেখে হারুন একটা চিৎকার দিয়ে চমকে দিল ফটিককে।

'ছু-উ-উ-উ-উ!
ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-উ-উ-উ!'

এই এক ডাক আর বাঁশির আওয়াজেই এখান থেকে ওখান থেকে ছেলের দল

ছুটে আসতে আরম্ভ করেছে হারুনের দিকে। তারা এসে দাঁড়াতেই হারুন একটা কান-ফাটানো তালি দিয়ে তিনবার পাক খেয়ে একটা ডিগবাজি আর একটা পেল্লায় লাফ দিয়ে তার আশ্চর্য লোক-ডাকার মন্ত্রটা শুরু করে দিল—

'ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-উ-উ-উ!
ছু মন্তর যন্তর ফন্তর
হর্ বিমারি দূর করন্তর
সাত সমন্দর বারা বন্দর
চালিস চুহা ছে ছুছুন্দর
ছু-উ-উ-উ!'

ছু বলেই বাঁশিতে আরেকটা লম্বা ফুঁ দিয়ে আরেকটা তালি আর আরেকটা ডিগবাজির পর আবার ধরল হারুনদা—

'কাম্! কাম্! কাম্! কাম!
'কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্!
কাম্ সী কাম্ সী চমকদারি
হর্ কিস্‌ম্ কি জাদুকারি
কলকত্তে কি খেল-খিলাড়ী
লম্বি দাড়ি লং সুপারি
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

কাম্ কামান্ডর ওয়ান্ডর ওয়ান্ডর
জাগ্‌লর জোকার জাম্পিং ওয়ান্ডর
ওয়ান্ডর খালিফ হারুন ওয়ান্ডর
ভেল্‌কী ভেলকাম্ কাম্ কমাকম
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

কামবয় গুডবয় ব্যাডবয় ফ্যাটবয়
হ্যাটবয় কোটবয় দিস-বয় দ্যাট-বয়
কালিং অলবয়, অলবয় কালিং
কালিং কালিং কালিং কালিং
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্!'

বাপ্‌রে, ভাবল ফটিক, কী গলার জোর, কী লোকডাকার কায়দা! এরই মধ্যে বেশ লোক জমে গেছে হারুনদাকে ঘিরে। হারুন তার থলি থেকে একটা

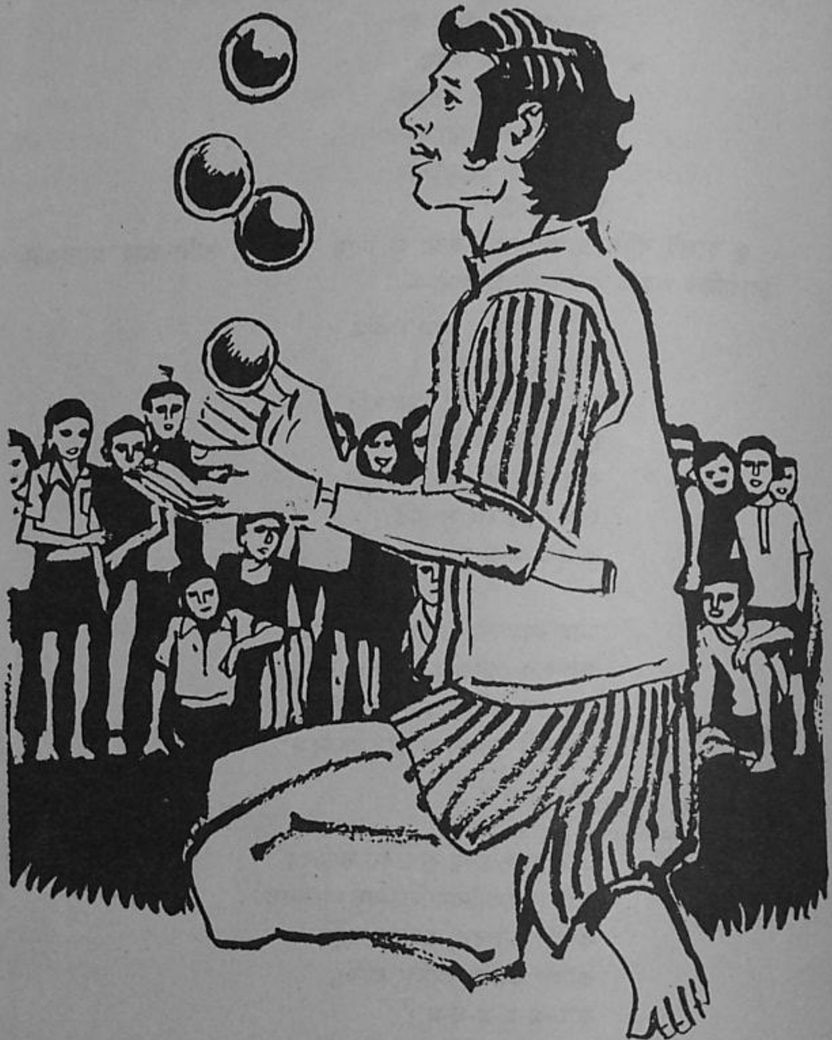

চকরাবকরা আসন বার করে ঘাসের উপর বিছাল। তারপর তার উপর বসে থলিতে যা কিছু খেলার সরঞ্জাম ছিল, সব একে একে বার করে নিজের দু-পাশে সাজিয়ে রাখল।

ফটিক দেখল, চারটে নকশা-করা ঝকঝকে পিতলের বল, দুটো প্রকাণ্ড লাট্টু, তার জন্য মানানসই লেত্তি, তিন-চারটে লাল নীল পালক লাগানো বাঁশের কঞ্চি, পাঁচ রকম নকশা-করা টুপি—যার একটা হারুনদা মাথায় পরে নিল। ফটিক এতক্ষণ হারুনকে জিনিস সাজিয়ে রাখতে সাহায্য করছিল, এবার হারুন বলল, 'তুই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়া, এক-একটা খেলা যেই শেষ হবে অমনি তালি দিবি।'

প্রথম দুটো খেলার পর ফটিকই তালি শুরু করল, তারপর অন্যরা দিল। তিন নম্বর খেলা থেকে ফটিককে আর ধরিয়ে দেবার দরকার হয়নি। সত্যি বলতে কি, সে হারুনের কাণ্ডকারখানা দেখে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তালি দেবার কথা আর মনেই ছিল না। শুধু হাতেরই যে কায়দা তা তো নয়। হারুনের কোমর থেকে উপরের সমস্ত শরীরটাই যেন জাদু। নমাজ-পড়ার মতো করে গোড়ালির উপর বসে অত বড় লাট্টুটায় দড়ি পেঁচিয়ে সেটাকে সামনের দিকে ছুঁড়ে লেত্তি ফুরোবার ঠিক আগে পিছন দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিলে সেটা যে কী করে শূন্য দিয়ে ঘুরে এসে আবার হারুনদারই হাতের তেলোয় পড়ছিল—বার বার ঠিক একইভাবেই একই জায়গায় পড়ছিল—সেটা ফটিকের মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না। আর সেখানেই তো শেষ না। লাট্টুটা হাতের তেলো থেকে ওই পালক-লাগানো কাঠির মাথায় বসিয়ে দিল হারুনদা আর ওই বোমা লাট্টুটা ঘুরতে লাগল ওই পেনসিলের মতো সরু কাঠিটার মাথায়। ফটিক ভাবল এটাই বুঝি খেলার শেষ, এখানেই বুঝি হাততালি দিতে হবে, কিন্তু ওমা—হারুনদা মাথা চিত করে ঘুরন্ত লাট্টু সমেত কাঠিটা বসিয়ে দিয়েছে ওর থুতনির ঠিক মাঝখানে! তারপর হাত সরিয়ে নিতে লাট্টুর সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটাও ঘুরতে লাগল থুতনির উপর দাঁড়িয়ে—আর সেই সঙ্গে তার গায়ে লাগানো রঙীন পালকগুলো। তারও পরে ফটিক অবাক হয়ে দেখল যে, কাঠিটা আবার মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘুরছে কিন্তু লাট্টুটা ঘুরে চলেছে একটানা।

পিতলের বলের খেলায় আরো বেশি হাততালি পেল হারুন। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার বলে চলে গেল জাগলিং দেখাতে দেখাতে। বিকেলের রোদে এমনিতেই বলগুলো ঝলমল করে উঠছে ; সেগুলো থেকে আবার আলো ঠিকরে বেরিয়ে হারুনের মুখে পড়াতে মনে হচ্ছে যেন তার মুখ থেকেই বার বার আলো বেরুচ্ছে।

সূর্য ডুবে যাওয়া অবধি খেলা চলল। শেষের দিকে পাশের খেলা থেকে

অনেক লোক চলে এসেছিল হারুনের খেলা দেখতে। ফটিক অবাক হয়ে দেখছিল বাচ্চারা পর্যন্ত কীরকম পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে হারুনের চারপাশে। হারুন কিন্তু খেলার সময় সেগুলোর দিকে দেখছেই না। খেলার শেষে ফটিককে ডেকে বলল, 'ওগুলো তোল তো।'

হারুন যতক্ষণে তার ভোজবাজির সরঞ্জাম থলিতে তুলেছে, তার আগেই ফটিকের পয়সা তোলা হয়ে গেছে। গুনে হল আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সা। থলি কাঁধে ঝুলিয়ে হারুন বলল, 'চল্, আজ তোকে খাওয়াব—পাঞ্জাবী রুমালি রুটি আর তরখা। নির্ঘাৎ এ জিনিস তুই কোনোদিন খাসনি। তারপর মিষ্টি কী খাওয়া যায় সেটা তখন ভেবে দেখা যাবে।'

॥ ৭ ॥

ফটিক তার শোবার জায়গার পাশের দেয়ালে একটা কাত্যায়নী স্টোর্সের ক্যালেন্ডার টাঙিয়ে দিয়েছে। তাতে পেনসিল দিয়ে প্রত্যেক দিনের শেষে সেই দিনের তারিখটার উপর একটা দাগ কেটে দেয়। এইভাবে দাগ গুনে সে হিসেব করে ক'দিন হল তার চাকরি। আট দিনের দিন, তার মানে বিষ্যুদবার, দুপুরে সাড়ে-বারোটার সময় উপেনবাবুর দোকানে একজন লোক এল, যে-রকম ষণ্ডা লোক ফটিক কোনোদিন দেখেনি। দোকানের আটটা বেঞ্চির মধ্যে যেটা দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে—মানে যেটা উপেনবাবুর বসার জায়গা থেকে সবচেয়ে দূরে—সেখানে বসেছে লোকটা। তার সঙ্গে অবিশ্যি আরেকজন লোক আছে ; তার চেহারা মোটেই চোখে পড়ার মতো নয়। ষণ্ডা লোকটা বেঞ্চিতে বসেই একটা 'অ্যাই' করে হাঁক দিয়েছে। ফটিক বুঝল যে তাকেই ডাকা হচ্ছে। থুতনিতে শ্বেতীওয়ালা ভদ্রলোক, যিনি রোজ এই সময় এসে এক কাপ চা সামনে নিয়ে আধ ঘন্টা ধরে খবরের কাগজ পড়েন, তিনি এইমাত্র উঠে গেছেন। ফটিক তাঁর পেয়ালা তুলে নিয়ে টেবিলটা ঝাড়ন দিয়ে মুছছিল, তার মধ্যে ষণ্ডা লোকটা আবার হাঁক দিয়ে উঠল।

'দুটো মামলেট আর দুটো চা এদিকে। জলদি।'

'দিচ্ছি বাবু।'

কথাটা বলতে ফটিকের গলাটা যে কেন একটু কেঁপে গেল, আর তার সঙ্গে হাতের কাপটাও, সেটা ও বুঝতে পারল না। অর্ডারটা কিচেনে কেষ্টদাকে চালান দিয়ে, হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে শ্বেতীওয়ালা লোকের পয়সাটা উপেনবাবুর কাছে দিয়ে ফটিক আরেকবার আড়চোখে ষণ্ডা লোকটার দিকে দেখে নিল। ওকে আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না ওর। তাহলে ওর গলা শুনে এমন হল

কেন ? লোক দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, রোগা লোকটা ষণ্ডাটাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে।

ফটিক ওদের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর হাতের ঝাড়নটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে গেল পান্নাবাবুর টেবিলের উপর রুটির গুঁড়ো পরিষ্কার করতে। অন্য যারা এ দোকানে আসে, পান্নাবাবু তাদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো জামাকাপড় পরেন। উনি এলে উপেনবাবুও উঠে গিয়ে খাতির-টাতির করেন। আর কেউ যেটা করে না সেটা দু'দিন পান্নাবাবু করেছেন ; ফটিককে দশ পয়সা করে বকশিশ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা দশ আজকে এই পাঁচ মিনিট আগে পেয়েছে ফটিক। ও ঠিক করেছে, বকশিশের পয়সা জমিয়ে ও হারুনদার ধার শোধ করবে।

অমলেট তৈরি হচ্ছে। সবাই বলে মামলেট, কেবল হারুনদা বলে অমলেট, আর সেটাই নাকি ঠিক। ফটিকও তাই মনে মনে অমলেট বলে। কেষ্টদা দু-কাপ চা এগিয়ে দিল, ফটিকও স্টাইলের মাথায় কাপ দুটো হাতে নিয়ে একটুও চা পিরিচে না-ফেলে সে দুটোকে এক নম্বর টেবিলের উপর ষণ্ডা আর রোগাটার সামনে রেখে দিল। একটা জিনিস ও দু'দিন থেকে করতে আরম্ভ করেছে। যেটা দিচ্ছে সেটাও বলে দেয় আর যেটা বাকি সেটাও বলে—তারপরে একটা 'কামিং' জুড়ে দেয়। আজ যেমন বলল, 'মামলেট কামিং।'

কথাটা বলে ষণ্ডাটার দিকে চাইতেই ফটিক দেখল লোকটার মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে, আর সেই হাঁ-এর ভিতর সিগারেটের না-ছাড়া ধোঁয়াটা পাক খেয়ে আপনা থেকেই ফিতের মতো বেরিয়ে আসছে।

ধোঁয়াটা দেখবার জন্যই ফটিক বোধহয় পাঁচ সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছিল, এবার উলটো ঘুরতেই লোকটা কথা বলল।

'অ্যাই—'

ফটিক থামল।

'তুই কদ্দিন কাজ করছিস ?'

পুলিশ !

হতেই হবে পুলিশ। না হলে ও-রকম জিজ্ঞেস করছে কেন ? ফটিক ঠিক করে নিল বানিয়ে বলবে, কিন্তু আস্তে বলবে, যাতে উপেনবাবু শুনতে না পান। আড়চোখে একবার উপেনবাবুর দিকে চাইতেই দেখল তিনি নেই। যাক্, বাঁচা গেল।

'অনেকদিন বাবু।'

'তোর নাম কী ?'

'ফটিক।'

ফটিক তো ওর নিজের বানানো নাম, তাই সেটা বললে কোনো ক্ষতি নেই।

'চুল ছেঁটেছিস কবে ?'

'অনেকদিন বাবু।'

'কাছে আয়।'

ওদিক থেকে কেষ্টদা জানান দিচ্ছে মামলেট রেডি।

'আপনার মামলেট আনি বাবু।'

ফটিক কেষ্টদার কাছ থেকে প্লেট এনে লোক দুটোর সামনে রাখল। তারপর দু-নম্বর থেকে নুন-মরিচ এনে তার পাশে রাখল। ষণ্ডা আর অন্য লোকটা এখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, ওর দিকে দেখছে না। ফটিক চার নম্বরের দিকে

চলে গেল। খদ্দের এসেছে।

লোক দুটো খাওয়া শেষ করে যখন ফটিককে পয়সা দেবে তখন ষণ্ডা লোকটা বলল, 'তোর হাতে চোট লাগল কী করে ?'

'দেয়ালে ঘষটা লেগেছিল।'

'দিনে ক'টা মিথ্যে বলা হয় চাঁদু ?'

লোকটাকে না চিনলেও, ওর কথাগুলো শুনতে ফটিকের ভালো লাগছিল না। ও ঠিক করল হারুনদা এলে ওকে বলবে।

'জবাব দিচ্ছ না যে ?'

লোকটা এখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। ঠিক এই সময় উপেনবাবু রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। ফটিককে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হওয়াতে বললেন, 'কী হয়েছে ?'

ফটিক বলল, 'বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন—'

'কী ?'

'আমি কদ্দিন এখানে কাজ করছি তাই।'

উপেনবাবু ষণ্ডার দিকে চেয়ে বেশ নরম ভাবেই বললেন, 'কেন মশাই, কী দরকার আপনাদের ?'

ষণ্ডা কিছু না বলে পয়সাটা টেবিলের উপর রেখে উঠে পড়ল আর সেই সঙ্গে অন্য লোকটাও। কাজের চাপে বিকেল হতে-না-হতে ফটিক লোক দুটোর কথা প্রায় ভুলেই গেল।

॥ ৮ ॥

বিকেল চারটে নাগাদ হারুন উপেনবাবুর দোকানে এল। সে ক'দিন থেকেই বলে রেখেছে সে কোথায় থাকে সেটা ফটিককে দেখিয়ে দেবে। উপেনবাবুকে বলাতে উনি রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, বাকি ঘন্টা তিনেকের কাজ কেষ্টর ছেলে সতু চালিয়ে নিতে পারবে। সতু মাসে তিনবার করে জ্বরে পড়ে ; না হলে কাজ যে একেবারে জানে না তা নয়।

হারুন দোকান থেকে বেরিয়ে ফটিককে বলল, 'আজ এমন একটা আর্ট দেখাব তোকে যে তুই ব্যোমকে যাবি।' কথাটা শুনে ফটিকের মন এমন নেচে উঠল যে, উলটো দিকের ফুটপাথের পানের দোকানের সামনে সকালের সেই দুটো লোককে ও দেখতেই পেল না।

হারুনদা ঝুলে ঝুলে বাসে চড়ে না, কারণ তাতে তার হাতের ক্ষতি হতে পারে। 'হাত না চললে পেট চলবে না রে ফটকে, তাই পদব্রজই বেস্ট।'

অনেক অলিগলি ছোটবড় মাঝারি রাস্তা পেরিয়ে হারুন আর ফটিক শেষটা ব্রিজের উপর পৌঁছাল, যেটার তলা দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন যায়। ব্রিজ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গিয়ে একটা বস্তিতে পড়েছে। এই বস্তিতেই থাকে হারুনদা। ফটিক ব্রিজের উপর থেকেই দেখল, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বস্তিটা। দূরে এখানে-ওখানে কারখানার চিমনি দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছের উপর মাথা তুলে। বস্তিটাকে দেখে ফটিকের মনে হল, সেটা যেন একটা ধোঁয়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে রয়েছে। হারুনদা বলল, সেটা উনুনের ধোঁয়া ; সন্ধ্যের মুখে

ঘরে ঘরে উনুন জ্বলেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হারুন বলল, 'এখানে হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান সবরকম লোক থাকে, জানিস। আর তাদের মধ্যে এমন এক-একটা আর্টিস্ট আছে না—দেখলে তাক লেগে যায়। জামাল বলে একটা কাঠের মিস্তিরি আমার ঘরে এসে গান শুনিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আমি আমার চৌকিতে ঠেকা দিই। কোথায় আছি ভুলে যাই, এমনি তার আর্টের ভেল্‌কি।'

দু'দিকে খোলার ছাতওয়ালা বাড়ির মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে হারুনের বাড়ির দিকে। হারুন আর ফটিক পাশাপাশি হাঁটছে, আর এদিক-সেদিক থেকে আট-দশ-বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা হারুনকে দেখে লাফাচ্ছে, তালি দিচ্ছে, আর তার নাম ধরে ডেকে উঠছে। হারুন সব্বাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সঙ্গে নিয়ে নিল ; বলল, 'আজ নতুন খেলা !'—'হো !—নতুন খেলা !'— বলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। হারুনদার যে এত বন্ধু আছে সেটা ফটিক জানতই না।

হারুনের ছোট্ট একটা ঘর, তাতে আলো বেশি আসে না, তাই বোধহয় হারুনদা এত রকম রঙচঙে জিনিস ঘরে সাজিয়ে টাঙিয়ে বিছিয়ে রেখেছে। কাপড়, কাগজ, পুতুল, ছবি, নকশা, ঘুড়ি সবকিছুই আছে। কিন্তু তাও দেখলে দোকান বলে মনে হয় না। যেখানে যেটা রাখলে মানায়, সেইটুকুই—তার বেশিও নয়, কমও নয়। ফটিক মনে মনে ভাবল, এটাও নিশ্চয়ই একটা দারুণ আর্ট। এছাড়া অবিশ্যি কাজের জিনিসও যতটুকু দরকার ততটুকু আছে। আর আছে হারুনের সেই বাক্স আর সেই থলি।

এত সব জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল, এবার বাতিটা জ্বালতেই সেটার দিকে চোখ গেল ফটিকের।

'ওটা কার ছবি হারুনদা ?'

বাতিটার ঠিক নিচেই বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছোট্ট ছবি। গোঁফে চাড়া দেওয়া ঢেউ-খেলানো চুলওয়ালা একজন লোক সোজা ফটিকের দিকে চেয়ে আছে। তার তলায় খুব ধরে ধরে পরিষ্কার করে কালো কালিতে লেখা—এন্‌রিকো রাস্‌টেলি।

হারুন একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ও আমার আরেক গুরু। চোখে দেখিনি কখনো। ইতালিয়ান সাহেব। আমি যে খেলা দেখাই ও-ও সেই খেলা দেখাত। জাগ্‌লিং। প্রায় একশো বছর আগে। একটা ম্যাগাজিন থেকে ছবিটা কেটে রেখেছিলুম। আমাকে তো চারটে বল নিয়ে খেলতে দেখলি—ও খেলত একসঙ্গে দশটা বল নিয়ে। ভাবতে পারিস ? পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—একেবারে দশটা ! লোকে দেখে একেবারে পাগলা হয়ে যেত।'

হারুনদা জাগ্‌লিং নিয়ে পড়াশুনা করেছে শুনে ফটিক অবাক হয়ে গেল। ও কি তাহলে ইংরিজি পড়তে পারে ? 'ক্লাস এইট অবধি পড়েছিলুম ইস্কুলে', বলল হারুন। 'চন্দননগরে বাড়ি ছিল আমাদের। বাপের ছিল কাপড়ের দোকান। মাহেশের রথের মেলায় ভালো ভোজবাজি হচ্ছে শুনে চলে গেলুম দেখতে। দু'দিনের জন্য হাওয়া। ফাস্ কেলাস জাগ্‌লিং, জানিস। কিন্তু ফিরে আসতে বাপ দেখিয়ে দিলেন আরেকরকম জাগ্‌লিং। কাপড় কাটার ঢাউস কাঁচি হয় দেখেচিস ? এই দ্যাখ তার রেজাল্ট।'

হারুন শার্ট তুলে পিঠে একটা গর্ত দেখিয়ে দিল।

'তিন হপ্তা লেগেছিল ঘা শুকুতে। তারপর একদিন মওকা বুঝে পকেটে এগারোটি টাকা আর কাঁধে পুঁটলি নিয়ে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লুম কাউক্কে কিচ্ছু না বলে। তিনবার ট্রেন বদল করে বিনি-টিকিটে ঝ্যাকড় ঝ্যাকড় করে তিন দিন তিন রাত্তির স্রেফ চা-বিস্কুট খেয়ে শেষটায় একদিন কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি তাজমহল দেখা যাচ্ছে। নেমে পড়লুম। শহরে ঘুরতে ঘুরতে কেল্লায় গিয়ে হাজির হলুম। পেছনে মাঠ, তার পেছনে যমুনা, আর তারও পেছনে দূরে আবার দেখলুম তাজমহল। তারপরেই আমার চোখ গেল উলটো দিকে। কেল্লার গায়ে উপর দিকে বারান্দা, তার নিচে বাইরে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে। এক পাশে সাপ খেলছে, এক পাশে ভাল্লুক নাচছে, আর মধ্যিখানে, আসাদুল্লা দু-হাতে বল নাচাচ্ছে—তার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা !...ভক্তি কি সাধে হয় রে ফটকে ? গায়ের লোম খাড়া হয়ে চোখে জল এসে গেস্‌ল। মানুষের এত খ্যামতা হয় ?'

'কারা দেখছিল সেই খেলা ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'সাহেব, মেমসাহেব,' বলল হারুন। 'ওই উঁচুতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, আর নিচের দিকে দশ টাকা পাঁচ টাকার করকরে নোট পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—কেউ সাপের দিকে, কেউ ভাল্লুকের দিকে, কেউ বল খেলার দিকে। বেশির ভাগ বলের দিকেই ছুঁড়ছে। এক ব্যাটা সাহেবের মাথা মোটা, সে ব্যাটা না-পাকিয়েই ছুঁড়েছে একটা দশ টাকার নোট বলের দিকে, আর দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ফেলেছে একেবারে ফণা-তোলা গোখরোর ঝাঁপির মধ্যে। ওস্তাদ তখন চোখের বাঁধন খুলে ফেলেছে। সাহেব উপর থেকে চেঁচাচ্ছে, আমি বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপির ভেতর ঘপাৎ করে হাত ঢুকিয়ে নোট বার করে এনে ওস্তাদের হাতে গুঁজে দিলাম। ওস্তাদ 'সাবাস বেটা—জিতে রহো' বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আমি হিন্দি-ফিন্দি জানি না—পকেট থেকে দুটো কাঠের বল বার করে এই তিন দিনে শেখা লোফার খেলা দেখিয়ে দিলাম। ব্যস্—সেই দিন থেকে ওর দেহ রাখার দিনটা অবধি

আমি ওর ছায়ায়। তবু অ্যাদ্দিনেও লোকের সামনে সাহস করে চোখ বেঁধে খেলা দেখাতে পারিনি। আজ সেইটেই একবার চেষ্টা করে দেখব।'

বস্তির ছেলেমেয়ের দল হারুনের দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। হারুন থলি নিয়ে বেরোল, ফটিক তার পিছনে। বাঁ দিকে ঘুরল হারুন। আট-দশটা ঘর পেরিয়ে একটা খোলা জায়গা, তার পিছনে একটা ডোবা আর তারও পিছনে একটা কারখানার পাঁচিল। হারুন ডান দিকে খোলা জায়গাটার মধ্যে যেখানটা জংলাটা কম, সেখানে বসে পড়ল আসন বিছিয়ে। ছেলেমেয়েদের দল তার সামনে আর দু'পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারুন থলি থেকে বার করল একটা হলদের উপর কালো বুটি দেওয়া সিল্কের রুমাল। সেটা পাশেই দাঁড়ানো ফটিকের হাতে দিয়ে বলল, 'বাঁধ্ তো দেখি বেশ করে।'

ফটিক রুমালটা দিয়ে হারুনের চোখ বেঁধে পিছিয়ে ভিড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় হারুন তার গুরুকে তিনবার সেলাম জানিয়ে প্রথমে দুটো আর তারপর তিনটে পিতলের বল নিয়ে এমন আশ্চর্য খেলা দেখাল যে, ফটিকের মনে হল, তার মন থেকে যদি আবার সব মুছে গিয়ে শুধু আজকের খেলাটাই থেকে যায়, তাহলে তাই নিয়েই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বলেই শেষ না। বল রেখে এবার বাঁধন না খুলেই হারুন থলি থেকে বার করল তিনটে ছুরি, যার আয়নার মতো ঝকঝকে ফলাগুলোতে বাড়ি-ঘর-গাছ-আকাশ সব-কিছু দেখা যাচ্ছে। ওই ফলাগুলো এবার নাচতে শুরু করল হারুনের হাতে। হারুনের সামনের আকাশ বাতাস চিরে ফালাফালা হয়ে গেল, কিন্তু একটিবারও ছুরিগুলো পরস্পরের গায়ে ঠেকল না, একটিবারও হারুনের হাতে একটি আঁচড়ও লাগল না।

বস্তির আকাশ যখন হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ছে, তখন ফটিক এগিয়ে গিয়ে হারুনের বাঁধন খুলতে গিয়ে পারল না, কারণ তার হাত কাঁপছে। হারুন বুঝতে পেরে হেসে নিজেই বাঁধন খুলে নিল। তারপর তার সরঞ্জাম থলিতে পুরে বাচ্চাদের দিকে ফিরে বলল, 'আজকের মতো খেল্ খতম। তোরা যে যার ঘরে ফিরে যা !'

ফটিকের কেন জানি মনে হচ্ছিল, এমন একটা খেলা দেখিয়ে হারুনের মুখে যতটা হাসি ফুর্তি থাকা উচিত ছিল, ততটা যেন নেই। হয়তো ওস্তাদের কথা মনে পড়ে তার মনটা ভারি হয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে তা নয়। ঘরে ফিরে এসে হারুন কারণটা বলল ফটিককে।

'দুটো লোক—বুঝলি ফটিক—বেপাড়ার লোক—দেখিনি কখনো—দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল তোর দিকে। বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াতেই চোখ গেছে আমার। লোক দুটোর ভাবগতিক ভালো লাগল না।'

কথাটা বলতেই ফটিকের ধক্ করে সেই দুটো লোকের কথা মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'একজন ষণ্ডা আর একজন রোগা কি ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তুইও দেখলি ?'

'এখন দেখিনি, দুপুরে।'

ফটিক বলল দুপুরের ব্যাপারটা। শুনে হারুনের মুখটা থমথমে হয়ে গেল। 'কানে লোমটা একটু বেশি কি ?' হারুন জিজ্ঞেস করল। ফটিকের তক্ষুনি মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো ! সবচেয়ে আগে কানের দিকেই চোখ গিয়েছিল ফটিকের—এখন হারুনদা বলাতে মনে পড়েছে।

'শ্যামলাল', চোয়াল শক্ত করে বলল হারুন। 'ওপর দিকটা ষণ্ডা হলে কী হবে, পা দু'খানা ধনুকের মতো বাঁকা। দূর থেকে পা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। দাড়ি ছিল, কামিয়ে ফেলেছে। কানের দাড়িটা আর কামানোর কথা খেয়াল করেনি। বছর কয়েক আগে চিৎপুরের একটা চায়ের দোকানে যেতুম মাঝে মাঝে। সেখানে দেখিচি। চার বন্ধু ছিল। একের নম্বরের—'

হারুন হঠাৎ থেমে গিয়ে ভুরু কুঁচকে আবার বলল, 'দু'জন লোক মরে পড়েছিল গাড়িতে—তাই না ?'

ফটিক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হারুনের মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, 'যা আঁচ করেছিলাম তাই রে ফটিক। তোর বাপের অনেক পয়সা।'

বাবা-টাবার কথা বললে ফটিকের মনে কোনো ভাবই জাগে না, তাই ও চুপ করে রইল। হারুন তক্তপোশ ছেড়ে উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানালার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখে বলল, 'এখনো আছে। সিগারেট ধরাল।'

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ফটিকের মনে পড়ল ওকে বাড়ি ফিরতে হবে। সেই বেনটিং স্ট্রীটে। হারুনদা ওকে পৌঁছে দেবে বলেছে, কিন্তু লোক দুটোর যদি মতলব খারাপ হয়ে থাকে তাহলে ওদের দু'জনেরই মুশকিল হতে পারে।

হারুনদা আবার তক্তপোশে বসে পড়েছে। ওকে এত গম্ভীর কখনো দেখেনি ফটিক। 'আমার বাড়ি ফেরার কথা ভাবছ ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

হারুন বলল, 'বাড়ি ফেরার অন্য রাস্তা আছে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লখা মিস্তিরির ঘরের ভেতর দিয়ে ওদিকের গলিটা ধরব। শ্যামলাল টের পাবে না। যদ্দুর মনে হয়, তল্লাটটা ও ভালো চেনে না। তোকে ধাওয়া করে এসে পড়েচে। না, ওটা চিন্তা না। চিন্তা তোর হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে।' হারুন একটু

থামল। তারপর ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'তোর এখনো কিচ্ছু মনে পড়েনি ?'

ফটিক মাথা নাড়ল।—'কিচ্ছু না হারুনদা। মনে-পড়া কাকে বলে তাই জানি না।'

হারুন হাঁটুতে একটা চাঁটি মেরে উঠে পড়ল। তারপর ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে দরজায় একটা তালা এঁটে ফটিককে নিয়ে সামনের দরজার দিকে না গিয়ে উলটো দিকে ঘুরল।

॥ ৯ ॥

পরের রবিবারের সকাল।

ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যালের বাড়িতে আজ মিটিং বসেছে বৈঠকখানায়। প্রায় ষাট বছরের পুরনো অভিজাত বাড়ির প্রকাণ্ড ড্রইংরুম। ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালে যাঁর বাঁধানো ছবি রয়েছে, তাঁরই কীর্তি এই বাড়ি। ইনি শরদিন্দু সান্যালের পরলোকগত পিতৃদেব দ্বারকানাথ সান্যাল। ছেলে বাপেরই পেশা নিয়েছেন, তবে বাপের মতো এত অঢেল রোজগারের ভাগ্য তাঁর কখনো হয়নি। শোনা যায় দ্বারিক সান্যালের এক সময় আয় ছিল গড়ে দিনে হাজার টাকা।

আগের দিনের চেয়ে আজ যেন মিস্টার সান্যালের দাপটটা একটু কম। আসলে এতদিনেও গুণ্ডাদের কাছ থেকে কোনো হুমকি চিঠি না পেয়ে তিনি একটু ধাঁধায় পড়েছেন। সেই সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাটাও আরো বেড়ে গেছে। আজ শুধু মিস্টার সান্যাল ও দারোগা সাহেব নন—ঘরে আরো দু'জন লোক রয়েছেন, মিস্টার সান্যালের দুই ছেলে, মেজো আর সেজো। বড়টিও এসেছিল, তবে দু'দিনের বেশি থাকতে পারেনি, দিল্লীতে তার একটা জরুরী মিটিং আছে।

মেজো ছেলে সুধীন্দ্রই এখন কথা বলছে। বছর ছাব্বিশেক বয়স, রং ফরসা, আজকের ফ্যাশানের ঝুলপিটা বড়, আর চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। সুধীন্দ্র বলছে, 'মেমরি লসের অনেক ইয়ে তো বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়া যায় বাবা। এটা তো হতেই পারে। তুমি যে কেন বিশ্বাস করছ না সেটা আমি বুঝতেই পারছি না। অ্যামনিসিয়ার কথা পড়নি ?'

সেজো ছেলে প্রীতীন কিছুই বলছে না। হারানো ভাইয়ের সঙ্গে নিজের বয়সের তফাতটা সবচেয়ে কম বলেই বোধহয় প্রীতীনের মনটা অন্যদের চেয়ে বেশি ভারি। ও বাবলুকে ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছে, মোনোপলি শিখিয়েছে, দরকার হলে অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছে, এই সেদিনও সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেছে।

প্রীতীন খড়গপুর চলে যাবার পর থেকে অবিশ্যি দু-ভাইয়ের দেখা কমে গেছে। এখন যে প্রীতীন মাঝে মাঝে দু-হাতের তেলো দিয়ে কপালে আঘাত করছে তার কারণ ওর বিশ্বাস, ও কলকাতায় থাকলে বাবলুকে এইভাবে কিডন্যাপ করা সম্ভব হত না। ওর কেন যে এরকম ধারণা হল সেটা বলা মুশকিল, কারণ ও সেই সময় কলকাতায় থাকলেও ভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকত না। বাবলু ফিরছিল ইস্কুল থেকে। বাড়ি কাছে হাওয়ায় বৃষ্টি না থাকলে ও হেঁটেই ফেরে। সঙ্গে থাকে ওর বন্ধু পরাগ—যার বাড়ি ওর তিনটে বাড়ি পরেই। সেদিন ইস্কুল ছুটি ছিল, কিন্তু ইস্কুলেরই খেলার মাঠে শিশুমেলা হবে কয়েকদিনের মধ্যেই, তাই কিছু ছেলেকে বাছাই করা হয়েছিল তার তোড়জোড়ে সাহায্য করার জন্য। বাবলু ছিল তাদের মধ্যে একজন। পরাগ ছিল না। তাই বাবলু সেদিন একাই বাড়ি ফিরছিল বিকেল সাড়ে-পাঁচটার সময়। সেই সময় তাকে ধরে নিয়ে যায় গুণ্ডার দল একটা নীল রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে। ঘটনাটার একজন সাক্ষীও ছিল, পোদ্দারদের বাড়ির বুড়ো দারোয়ান মহাদেও পাঁড়ে।

'তাই যদি হয়,' মিস্টার সান্যাল একটু ভেবে বললেন, 'তাহলে তো সে ছেলে বাড়ি ফিরে এলে কাউকে চিনতেই পারবে না।'

'সেটারও ট্রিটমেন্ট হয়,' সুধীন্দ্র বলল। 'লস্ট মেমরি ফিরিয়ে আনা যায়। তুমি এ বিষয়ে ডক্টর বোসকে কনসাল্ট করে দেখতে পার। আর এখানে যদি সে-রকম স্পেশালিস্ট না থাকে, বিদেশে নিশ্চয়ই আছে।'

'তাহলে—' মিস্টার সান্যাল সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তিনি তাঁর কথা শেষ করার আগেই দারোগা মিস্টার চন্দ বললেন, 'আমি যেটা বলছি সেটাই করুন স্যার। অ্যাদ্দিনেও যখন তারা কোনো উচ্চবাচ্য করল না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার ছেলে অন্য কোথাও আছে। আর সে যদি সব-কিছু ভুলে গিয়েই থাকে, তাহলে তো সে আর নিজে থেকে বাড়ি ফিরবে না। তাই বলছি, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। রিওয়ার্ড অফার করুন। তারপর দেখুন কী হয়। এতে তো আর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আপনার।'

'ওই লোক দুটোর কোনো হদিশ পেলেন?' মিস্টার সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে হয় তারা কলকাতাতেই আছে,' বললেন দারোগাসাহেব, 'তবে খোঁজ যাকে বলে সেটা এখনো ঠিক...'

শরদিন্দু সান্যাল ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাতটা চালিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে তাই করা যাক্। বলু, তুই কালকের দিনটা থেকে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাটা করে দে। পিটু ছেলেমানুষ, পারবে না।'

সুধীন্দ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। প্রীতীন্দ্র অপমানবোধে একটু নড়েচড়ে

বসল।

'ক'টা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলছেন আপনি?'

প্রশ্নটা দারোগাসাহেবকে করলেন মিস্টার সান্যাল। চন্দ বললেন, 'পাঁচটা তো বটেই—মিনিমাম। ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিনটে ভাষাতেই দেওয়া উচিত। আমি হলে উর্দু আর গুরুমুখীটাও বাদ দিতাম না। কোন্ দলে গিয়ে পড়েছে আপনার ছেলে সে তো জানার উপায় নেই।'

'ওর একটা ছবিও দিতে হবে তো?'

এবার প্রীতীন্দ্র কথা বলল।

'আমার কাছে ছবি আছে বাবলুর। লাস্ট ইয়ার দার্জিলিং-এ তোলা।'

'দেওয়াই যখন হচ্ছে', বললেন মিস্টার সান্যাল, 'তখন ভালো করে চোখে পড়ার মতো বিজ্ঞাপন হয় যেন। খরচটা কোনো কথা না।'

॥ ১০ ॥

আজ সকাল থেকেই ফটিকের মনটা চনমনে। আজ হারুনদা প্রথম ময়দানে চোখ বেঁধে জাগ্‌লিং দেখাবে। সেদিন থেকে হারুন রোজই নিয়মমতো উপেনবাবুর দোকানে এসেছে। আগে একবার করে আসত, এ ক'দিন দু-বেলা এসেছে। সেদিন ওর বাড়ি থেকে ফিরতে ফটিকদের কোনো অসুবিধা হয়নি। শ্যামলাল আর সেই লোকটা ওদের পিছু নেয়নি।

হারুন যে কলকাতার অলিগলি কী-রকম ভালোভাবে জানে সেটা ফটিক সেদিন বুঝতে পেরেছে। লোকগুলো পিছু নিলেও হারুনের চরকিবাজির চোটে হিমসিম খেয়ে যেত।

হারুন প্রতিবার এসেই ফটিককে জিজ্ঞেস করেছে সেই দুটো লোক আর এসেছিল কিনা। কিন্তু তারা আর আসেনি। দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে কিনা সেটা ফটিক জানে না, কারণ রোজই তাকে সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বাইরে গিয়ে দু-দণ্ড দাঁড়াবারও সময় পায়নি। এ ক'দিনে তার কাজ আরো অনেকটা সড়গড় হয়ে এসেছে। গোড়ায় রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে বুঝতে পারত হাত দুটোতে একটা অবশ ভাব, কিন্তু গত ক'দিন সেটাও হয়নি। এমন-কি বিষ্যুদবার থেকেই ও কাজের পর খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় বসে দুটো কাঠের বল নিয়ে লোফালুফি অভ্যাস করেছে। বল দুটো হারুনদাই এনে দিয়েছে, একটা হলদে একটা লাল। কী করে লুফতে হয় সেটাও হারুনদা শিখিয়ে দিয়ে বলেছে, 'তুই যে আর্টটা শিখছিস সেটা পাঁচ হাজার বছর আগেও মিশরদেশে ছিল। পাঁচ হাজার কী বলছি—সৃষ্টির আদি থেকে ছিল। লক্ষ লক্ষ

কোটি কোটি বছর আগে।' ফটিক অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাবল হারুনদা বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু হারুন বুঝিয়ে দিল।

'এই যে পৃথিবী—এটাও তো একটা বল। আরো যত গ্রহ আছে—মঙ্গল বুধ বিষ্যুদ শুক্কুর শনি—সব এক-একটা বল। আর সব ব্যাটা ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। অথচ কেউ কারুর গায়ে গায়ে লাগছে না। ভাবতে পারিস ? এর চেয়ে বড় জাগ্‌লিং হয় ? রাত্তিরে আকাশের দিকে চাইলেই বুঝবি কী বলছি।...বল দুটো যখন হাতে নিবি, তখন এই কথাটা মনে রাখিস।'

কিন্তু লোক দুটো না এলেও ফটিক বুঝতে পারছে যে হারুনদার মনে একটা ভয় ঢুকে গেছে যেটা সহজে যাবার নয়। এক এক সময় মনে হয় শুধু ভয় না, আরো কিছু ; কিন্তু সেটা যে কী সেটা ফটিক বুঝতে পারে না। ও খালি লক্ষ করে যে হারুনদার চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা মাঝে মাঝে চলে গিয়ে চোখ দুটো কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

এসব কথা অবিশ্যি ময়দানে গিয়ে আর ফটিকের মনে হয়নি। হারুন গত রবিবারে যেখানে খেলা দেখিয়েছিল, সেখানে আজ আগে থেকেই ছেলের দল ভিড় করে রয়েছে। ফটিক তাদের কয়েকজনকে দেখেই চিনল। ওই যে সেই মুখে বসন্তের দাগওয়ালা কানা ছেলেটা ; ওই যে সেই বেঁটে বামুনটা যাকে দূর থেকে দেখলে বাচ্চা মনে হয়, আর কাছে এসেই গোঁফদাড়ি দেখে চমকে যেতে হয় ; আর ওই যে সেই লুঙ্গিপরা ঢ্যাঙা ছেলেটা যার দাঁত সবসময় বেরিয়ে থাকে। হারুনকে দেখেই ছেলের দল হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ করে উঠল।

হারুন তার জায়গায় বসে একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিল। ফটিক জানে কেন। পশ্চিমের আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি এলে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। হে ভগবান—যেন বৃষ্টি না হয়, যেন হারুনদা আজ চোখ বেঁধে খেলা দেখিয়ে এদের চোখ টেরিয়ে দিতে পারে, যেন সে আজ আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে। ইস্, কয়েকটা সাহেব-মেম ভিড়ের মধ্যে থাকলে বেশ হত ! এখানে কে ফেলবে দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট !

দূর থেকে আসা একটা মেঘের ডাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হারুন তার খেলা শুরু করে দিল। আজ থুতনির উপর লাট্টুর খেলাটা শেষ করে হারুন ভিড়ের মধ্যে থেকে ইশারা করে ফটিককে কাছে ডাকল। লাট্টুটা তখনো হারুনের তেলোতে ঘুরছে। ফটিক আসতেই হারুন তাকে হাত পাততে বলে নিজের হাত থেকে লাট্টুটা ফটিকের হাতে চালান দিয়ে বলল, 'ধর এটা।'

তেলোতে সুড়সুড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফটিকের সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে আজ হারুনদার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হারুনদার শিষ্য !

হারুন এবার আরেকটা ঘুরন্ত লাট্টু ডান হাতে নিয়ে অন্যটা ফটিকের হাত থেকে নিজের বাঁ হাতে নিয়ে নিল। তারপর যতক্ষণ দুটো লাট্টুতে দম থাকে, ততক্ষণ চলল চোখ-ধাঁধানো ঘুরন্ত লাট্টুর জাগ্‌লিং।

তারপর এমনি বলের খেলা শেষ হলে ফটিকের আবার ডাক পড়ল। হারুনদা থলি থেকে বুটিদার সিল্কের রুমালটা বার করে ফটিকের হাতে দিল। ফটিক রুমাল দিয়ে হারুনের চোখ ঢাকতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা হৈ-হৈ রব উঠল। অন্ধকার হয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ফটিক জানে তাতে কিছু এসে যাবে না ; হারুনদার চোখেও এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। এ খেল্ দেখাতে হারুনদার আলোর দরকার হয় না।

দু' বলের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফটিক বুঝেছে যে, আজকে আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পড়বে। অনেক নতুন লোক এসে জমা হয়েছে এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

হারুন থলে হাতড়ে তিন নম্বর পিতলের বল বার করল। বেশ জোরে একটা মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ-বাঁধা হারুন ওস্তাদের উদ্দেশে সেলাম জানিয়ে বল আকাশে ছুঁড়ল। বল চার পাক ঘোরার পর পাঁচ পাকের বেলা ফটিকের চোখের সামনে যেটা ঘটল, তার চেয়ে যদি আকাশ ভেঙে ওর মাথায় পড়ত তাতে ওর কষ্ট অনেক কম হত।

ঠিক হারুনদার মাথার উপরে একটা বল আরেকটা বলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা সাতচড়া কান-ফাটানো শব্দ করে ছিটকে গিয়ে পড়ল দু'দিকে ঘাসের উপর।

আরো অবাক এই যে, যে লোকগুলো এতক্ষণ হারুনকে তারিফ করছিল, তালি দিচ্ছিল, সাবাস দিচ্ছিল, তারা হঠাৎ রাক্ষস হয়ে গিয়ে বিকট সুরে হেসে উঠে সেই একই হারুনকে দুয়ো দিতে লাগল।

তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিড় উধাও হয়ে গিয়ে জায়গাটা খালি হয়ে গেল। এদিকে হারুন নিজেই চোখের বাঁধন খুলে থলির মধ্যে তার খেলার সরঞ্জাম তুলে ফেলেছে। ফটিক পয়সাগুলো তুলতে যাচ্ছিল, হারুন তার দিকে একটা ধমক ছুঁড়ে সেটা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘাসের উপর বসেই একটা বিড়ি ধরাল। ফটিক তার পাশে গিয়ে বসল। নিজে থেকে কিছু বলার সাহস নেই তার ; সে ইচ্ছেও নেই। চৌরঙ্গী থেকে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, যা এর আগের দিন, বা একটুক্ষণ আগে পর্যন্ত ফটিকের কানেই যায়নি। দুটো টান দিয়ে বিড়িটাকে ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হারুন বলল, 'মনের সঙ্গে হাতের এমন যোগ না রে ফটিক—একটা গুমসে গেলে অন্যটাও খেলতে চায় না।...যদ্দিন না তোর একটা হিল্লে হচ্ছে তদ্দিন ব্লাইন্ড জাগ্‌লিং এস্টপ্।'

কী বলছে এসব আবোলতাবোল হারুনদা ? বেশ তো আছে ফটিক। আবার কী হিল্লের দরকার ? হারুন বলে চলল, 'সেদিন শ্যামলালকে দেখার পর থেকেই তোর ঘটনাটা একটা ছকে এসে গেছে। লোকগুলো তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তোকে কোনো একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে তোর বাবার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে তবে তোকে ছাড়ত। ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যায় গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। শ্যামলাল আর আরেক ব্যাটা বেঁচে যায়, অন্য দুটো মরে। তোকে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতে দেখে শ্যামলালের হয়তো ধারণা হয়েছিল তুইও মরে গেছিস, তাই তোকে ফেলেই পালায়। তারপর সেদিন উপেনদার দোকানে গিয়ে দ্যাখে ফস্‌কে-যাওয়া শিকার আবার হাতের কাছে এসে গেছে।

'সেদিন তোকে পৌঁছে বাড়ি ফিরে এসে দেখি দু' ব্যাটা তখনো ঘুরঘুর করছে। এগারোটা পর্যন্ত ছিল, তারপর চলে যায়। আমি পেছনে ধাওয়া করি, করে ওদের ডেরাটা জেনে নিই। পুলিশে বললে ওরা ধরা পড়ে যায় ; কিন্তু ওদের ধরিয়ে দিলেই তো আর খেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে না।...আমার উচিত তোকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।'

'না না, হারুনদা।'

'জানি। তোর মন আমি জানি। তাই তো কিছু করতে পারছি না। আর সত্যি বলতে কী, তোর পরিচয়টা জানা হয়ে গেলে অন্য কথা ছিল। এখন তোকে পুলিশে দেওয়া আর একটা রাস্তার কুকুরকে পুলিশে দেওয়া একই ব্যাপার।'

কথাটা শুনে ফটিকের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ও বলল, 'রাস্তার কুকুর কাঠের বল নিয়ে জাগ্‌লিং করতে পারে ?'

'তুই অভ্যেস করচিস ?' হারুন জিজ্ঞেস করল, এই প্রথম ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে, এই প্রথম একটু হেসে।

'করছি না ?'—ফটিকের অভিমান এখনো যায়নি।—'সারাদিন কাজের পর রাত্তিরে ঘুমোনোর আগে এক ঘন্টা রোজ।' ফটিক পকেট থেকে বল দুটো বার করে হারুনকে দেখিয়ে দিল।

'গুড', বলল হারুন। 'দেখি, আর দুটো দিন দেখি। কেউ যদি তোর খোঁজখবর না করে তো তোকে সঙ্গে নিয়েই যাব।'

'কোথায় ?'—ফটিক অবাক। হারুনদা যে আবার কোথাও যাবার কথা ভাবছে সেটা ও এই প্রথম শুনল।

'এখনো ঠিক করিনি। কাল সেই ভেঙ্কটেশের একটা চিঠি পেয়েছি। আসতে লিখেচে। এইভাবে মাটি থেকে পয়সা কুড়িয়ে নিতে আর ভালো

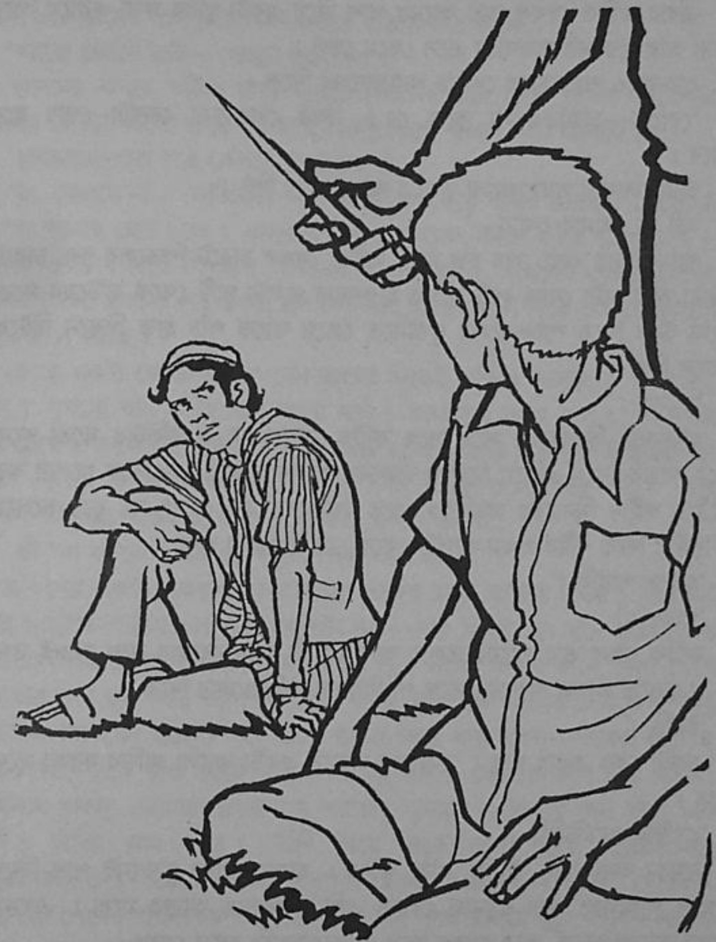

লাগছে না রে। অনেক দিন তো—'

'তোমার এই খুদে সাকরেদটি কে হে ?'

কথাটা এমন আচমকা এল যে ফটিকের মনে হল তার কলজেটা এক লাফে গলার কাছে চলে এসেছে।

সেই দুটো লোক অন্ধকারে পিছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফটিকের ডান

কাঁধের পাশে এখন শ্যামলালের ধনুকের মতো বাঁকা প্যান্ট-পরা বাঁ পা।

এবার ফটিক দেখল তার কানের পাশ দিয়ে একটা ছুরির ফলা এগিয়ে গিয়ে তার আর হারুনের মাঝখানে এসে থেমে গেল।

হারুনদাও আড়চোখে দেখছে শ্যামলালের দিকে।

'রোঘো—চাকতিগুলো তুলে নে। নন্দর দোকানের দেনাটা শোধ হয়ে যাবে।'

অন্য লোকটা পয়সাগুলো তুলতে আরম্ভ করে দিল।

'কী হে, আমার কথার—'

শ্যামলালের কথা শেষ হল না। ফটিক দেখল চারটে পিতলের বল, চারটে ছোরা আর দুটো বোমা লাট্টু সমেত হারুণদার থলিটা মাটি থেকে হাউয়ের মতো শূন্যে উঠে গিয়ে শ্যামলালের থুতনিতে লেগে তাকে পাঁচ হাত পিছনে ছিটকে ফেলে দিল।

'ফট্‌কে।'

হারুনদার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ফটিক দেখল সে-ও থলিটার মতো শূন্যে উঠে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে হারুনের বগলদাবা হয়ে। এদিকে ধুলোর ঝড় উঠেছে শহীদ মিনারের চারদিকে, আর ময়দানের যত লোক সব ছুটে চলেছে চৌরঙ্গীর দিকে বৃষ্টির প্রথম ঝাপটা থেকে রেহাই পাবার জন্য।

'ছুটতে পারবি ?'

'পারব।'

ফটিক বুঝল তার পায়ের তলায় আবার মাটি, আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই তার পা-ও চলতে লাগল হারুনের সঙ্গে পা মিলিয়ে গাড়িগুলোর দিকে।

'ট্যাক্সি !'

একটা ব্রেক কষার শব্দ। ফটিকের সামনে একটা কালো গাড়ির দরজা খুলে গেল।

'সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ !'

সামনে অন্য গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস, স্কুটার। হারুন ফটিক দু'জনেই পাশ ফিরে দেখছে শ্যামলাল আর রঘুনাথ দৌড়ে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মধ্যে। এখনো দিনের আলো আছে, তবে রাস্তায় আর দোকানে বাতি জ্বলে গেছে।

ট্যাক্সি সামনে ফাঁক পেয়ে রওনা দিল। হারুন ড্রাইভারকে বলল, 'বাড়তি পয়সা দোব ভাই—একটু তেজ লাগান।'

বাঁয়ে ঘুরে চৌরঙ্গী ধরে ট্যাক্সি এগিয়ে চলল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সামনে চৌমাথা। ধরমতলার মোড়। বাতি লাল ছিল ; ফটিকদের ট্যাক্সি পৌঁছতে সবুজ হয়ে গেল। গাড়ি মোড় পেরিয়ে বিজলি-আপিস বাঁয়ে ফেলে

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর চওড়া রাস্তা ধরল। রবিবার, তাই ভিড় কম। ফটিক বুঝল তার কানের পাশ দিয়ে শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

'আরো জোরে ভাই—পেছনে গণ্ডগোল।'

হারুনের কথায় ফটিক মাথা ঘুরিয়ে পিছনের কাঁচ দিয়ে দেখল আরেকটা ট্যাক্সির জোড়া আলো ক্রমে বড় হয়ে তাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে।

'হারুনদা—ওরা ধরে ফেলবে আমাদের !'

'না, ফেলবে না।' ফটিকের কান বাতাসে বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। জোড়া আলো আবার ছোট হচ্ছে। এবার ঝাপসা হয়ে গেল, কারণ কাঁচে বৃষ্টি পড়ছে। ফটিক সামনের দিকে ফিরল। সামনের কাঁচেও বৃষ্টি। সামনেও জোড়া জোড়া গোল আলো একটার পর একটা হুশ্ হুশ্ করে ট্যাক্সির পাশ দিয়ে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে।

এবার একটা জোড়া আলো যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। গাড়ি নয়, বাস। ধুমসো বাস। দৈত্যের মতো বাস। রাক্ষসের মতো বাস। ওই দুটো ওর চোখ। ক্রমে বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে। হতে হতে বাসটা হঠাৎ লরি হয়ে গেল। দু'পাশের বাড়িগুলো আর নেই...আলোগুলো আর নেই। তার বদলে অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার, জঙ্গল, জঙ্গল, জঙ্গল...

'কী হল ফট্‌কে ? এলিয়ে পড়লি কেন ? কী হল ?'

হারুনের প্রশ্নটা একরাশ ফিরে আসা শব্দের মধ্যে হারিয়ে গেল। প্রথমেই সেই গাড়িতে গাড়িতে লাগার কানফাটা শব্দ—যার পরেই ওর মনে হয়েছিল ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়ছে। সেটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কানে তালা লেগে যাওয়ার ভাব হল, আর তারপরেই তার বারো বছর তিন মাসের জীবনে যা-কিছু ঘটেছিল সব যেন হুড়মুড় করে এসে তাকে ঘিরে ধরে বলল—আমরা এসেছি, যখন চাও, যাকে চাও বেছে নাও। তারাই বলল, তোমার ভাল নাম নিখিল, ডাকনাম বাবলু, তোমার বাবার নাম শরদিন্দু সান্যাল ; তোমার তিন দাদা, এক দিদি ; দিদির নাম ছায়া। দিদি বিয়ে করে চলে গেছে বরের সঙ্গে সুইটজারল্যান্ড। তারাই বলল তোমার ঠামা তোমাদের বাড়ির দোতলায় বারান্দার শেষের বাঁ দিকের ঘরটাতে—রাতদিন পুজোর ঘরে খুটুং খাটুং—নাকের উপর চশমা এঁটে ইয়া মোটা কাশীরামের ছেঁড়া পাতার উপর ঝুঁকে পড়ে সুর করে দুলে দুলে পড়া ঠামা...ছোড়দা বলল, 'এই দ্যাখ, ড্রাইভ মারার সময় রিস্ট কী ঘোরে,' আর অঙ্কের স্যার মিস্টার শুক্লা বলছে, 'স্টপ ইট মনমোহন !'—মনমোহনের গোল মুখ গোল মাথায় এত সরু বুদ্ধি—যতবার বিক্রমটা পেনসিল কেটে ডেস্কের উপর রাখছে, ও পিছন থেকে কাগজের নল পাকিয়ে ফুঁ দিয়ে সেটাকে গড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। সবচেয়ে হাসি পায়

মনে করলে, দিদির বিয়েতে গ্রামোফোনে বিসমিল্লার সানাই, আর পুরনো রেকর্ড ফাটা জায়গায় এসে প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও একই জিনিস বারবার আর তাই শুনে সামিয়ানার তলায় যত লোক সব খাওয়াটাওয়া ফেলে হো হো হো হো— । আর হ্যাঁ, দার্জিলিং তো মনে পড়েই, আর তার আগের বছর পুরী, তার আগে মুসুরি, তার আগে আবার দার্জিলিং, আর তারও অনেক অনেক আগে ছোটবেলায় ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে পায়ের তলায় বালি সরে সরে যাচ্ছে আর সুড়সুড়ি লাগছে আর মনে হচ্ছে ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে সরসর সরসর করে সরে যাচ্ছে, আর মা যেই বললেন, পড়ে যাবে বাবলু সোনা, অমনি ধপাস্ ঝপাং !—মা'র কথা অবিশ্যি বেশি মনে নেই। এখন খালি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। এখন বাড়িতে লোক আর নেই। এত বড় বাড়ি আর তিনজন মাত্র লোক। ছোটকাকার তো মাথাই খারাপ। আগে ছিল বাড়িতেই, যখন মাথা ঠিক ছিল। এখন লুম্বিনীতে।...

ও আবার শুনতে পেল ট্যাক্সির শব্দ। বাইরের রাস্তার আলো দেখতে পেল। হারুনদা—হ্যাঁ, ওই তো হারুনদা—ওর পাশের জানালার কাঁচটা তুলে দিল।

'ভয় পেলি নাকি—অ্যাই ফট্‌কে,' হারুনদা বলছে। 'আর ভয় নেই। ওরা আর নেই পেছনে।'

ও শুনতে পেল, পাশের বাড়ির রাইট সাহেবদের অ্যালসেশিয়ানটা ভারি গলায় ঘেউ-ঘেউ করছে। কুকুরের নাম ডিউক। ও ডিউককে ভয় পায় না। ওর ভীষণ সাহস। ও রাত্রে একা শোয়। একবার দার্জিলিং-এ ও বার্চ হিলের রাস্তা দিয়ে অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল। ও তখন একা। ওর মনে আছে ও ভয় পায়নি।

'শরীর খারাপ লাগছে ? না মন খারাপ ?' হারুনদা জিজ্ঞেস করছে।

ও মাথা নাড়ল।

'তবে কী ?'

ও হারুনদার দিকে চাইল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ট্যাক্সি চলছে এখনো। কাঁচ তোলা, তাই আস্তে বললেও কথা শোনা যায়। ও আস্তেই বলল।

'সব মনে পড়ে গেছে হারুনদা।'

॥ ১১ ॥

ওরা দু'জন এখন চিৎপুরের একটা দোকানে বসে রুটি-মাংস খাচ্ছে। ও জানে এ-রকম জায়গায় এসে ও কোনোদিন খায়নি, হারুনদার সঙ্গে না এলে হয়তো

কোনোদিন আসত না। হারুনদা এতক্ষণ ওকে জিজ্ঞেস করে করে সব জেনে নিয়েছে। ইস্কুল থেকে ফেরার সময় লোকগুলো কী করে ওকে রাস্তা থেকে ছিনিয়ে তুলে নিল, তাও বলেছে।

'লাউডন স্ট্রীটে তোর বাড়িতে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবি ?' হারুন জিজ্ঞেস করল। 'ও তল্লাট আমার চেনা নেই।'

ও হেসে উঠল। —'আরেব্বাস, খুব সহজ।'

'হুঁ...'

হারুন একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আজ রাত করে যাবার দরকার নেই। আর তোর চেহারাটাকেও একটু ফিরিয়ে নিতে হবে। চুলটা আর একটু বড় হলে ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই। কাল পরিষ্কার প্যান্ট-শার্ট পরে রেডি থাকবি। আমি সক্কাল সক্কাল এসে পড়ব। উপেনদাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। আমি পরে ম্যানেজ করব।'

ও এখনো কিছুই ভালো করে ভাবতে পারছে না। বাড়ি তো যেতেই হবে। বাবা আছে, ঠামা আছে, হরিনাথ বুড়ো চাকর আছে। হরিনাথ ওর সব কাজ করে দেয়। ও চায় না, তা-ও করে দেয়। ওর রাগ হয়, কিন্তু হরিনাথ বুড়ো বলে কিছু বলে না। তারপর ইস্কুল আছে, রাম খেলাওন দারোয়ান, মিস্টার শুকুল হেডমাস্টার, পি-টি মাস্টার মিঃ দত্ত, ওর ক্লাসের বন্ধুরা—অঞ্জন, প্রীতম, রুসি, প্রদ্যোত, মনমোহন। একবার সেই চাঁদপাল ঘাট থেকে স্টীমার করে বোটানিক্স-এ পিকনিক...

ওর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, আর তক্ষুনি সেটা হারুনদাকে না বলে পারল না।

'আমাদের বাড়ির একতলায় একটা ঘর আছে, কেউ থাকে না হারুনদা ! খালি একটা পুরনো আলমারি আর একটু পুরনো ভাঙা টেবিল রয়েছে। ওগুলো সরিয়ে দিলেই তুমি থাকতে পারবে।'

হারুন একবার আড়চোখে ওর দিকে দেখে নিল। তারপর রুটির আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে বলল, 'আমার বস্তির ঘরের মতো করে সাজিয়ে নিতে দেবে তোর বাবা ?'

বাবার চেহারাটা মনে করে ও যে খুব ভরসা পেল তা নয় ; কিন্তু তাহলে কি হয় ? মানুষ তো বদলাতে পারে। তাই ও বলল, 'কেন দেবে না ? নিশ্চয়ই দেবে।'

'ভেরি গুড', বলল হারুন, 'তাহলে বলব তোর বাবা খাঁটি আর্টিস্ট। খলিফ হারুনের খেয়ালগুলো আর্টিস্ট ছাড়া কেউ বুঝবে না।'

॥ ১২ ॥

খবরের কাগজের সব-কিছুই যে সবাই পড়ে বা দেখে তা নয়। বিশেষ করে সাঁতরাগাছির কাছে একটা বিশ্রী রেল-দুর্ঘটনার খবর কাগজের সামনের পাতার অনেকখানি জুড়ে থাকায় অনেকেরই আর পিছনের পাতায় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েনি। যাদের পড়েছে তারা সকলেই স্বীকার করল যে ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁরা হারানো ছেলেকে ফিরে পাবার আশায় যে পুরস্কারটা ঘোষণা করেছেন, সেটা তাঁর মতো ধনী লোকের পক্ষে বেশ মানানসই হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা মুখের কথা নয়।

উপেনবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখেননি। হারুন নিয়মিত কাগজ না পড়লেও একবার অন্তত উলটে-পালটে দেখে সকালে সিংহিমশাইয়ের চায়ের কেবিনে বসে। আজ সেটা হয়ে ওঠেনি, কারণ তার সে মেজাজ ছিল না। ভোর সাড়ে-পাঁচটায় উঠে কোনোমতে এক কাপ চা খেয়ে সে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেছে ফটিকের কাছে। এখন বোধহয় আর ফটিক বলাটা ঠিক নয়; কিন্তু হারুনের কাছে ওই নামটাই ওর নাম। নিখিল নয়, বাবলু নয়, এমন কি সান্যালও নয়। ওর নাম ফটিকচন্দ্র পাল।

উপেনবাবু অবিশ্যি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন হারুন ফটিককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাতে হারুন বলল, 'একটু সাহেবপাড়ায় যাচ্ছি উপেনদা; ফিরে এসে সব বলব।' উপেনবাবু জানেন, হারুনের মাথায় মাঝে মাঝে ছিট দেখা দেয়। তবে লোকটা ভালো, তাই ওকে আর কিছু না বলে কেষ্টর ছেলে সতুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে হবে না। কাজ আছে, হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে।'

॥ ১৩ ॥

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর ক্লার্ক রজনীবাবুকে বললেন, 'আজকাল কাগজ আর ছাপা যা হয়েছে—এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। ...বাবলুর এমন সুন্দর ছবিটাকে এইভাবে ছেপেছে?'

'আপনি এইটে দেখেছেন স্যার?'—বলে রজীনবাবু একটা ইংরিজি কাগজ মিস্টার সান্যালের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'ওতে কিন্তু বাবলু বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।'

শরদিন্দু সান্যালের সামনে ডাঁই করা খবরের কাগজে। রজনীবাবুকে বলাই ছিল উনি যেন আসার সময় কিনে আনেন। এমনিতে রজনীবাবু সাড়ে-আটটায়

আসেন। আজ তাড়াতাড়ি আসার কারণ, সান্যাল সাহেবের বিশ্বাস, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই যত সব আজেবাজে লোক টাকার লোভে যেখান-সেখান থেকে ছেলে ধরে এনে তাঁর সামনে হাজির করবে। তখন ব্যাপারটা যাতে বেসামাল না হয়ে পড়ে, তার জন্য সেজো ছেলে প্রীতীন আর বেয়ারা কিশোরীলাল ছাড়াও তিনি রজনীবাবু ও জুনিয়র ব্যারিস্টার তপন সরকারকে সকাল সকাল আসতে বলেছেন। সরকার এখনো আসেননি, আর প্রীতীনের এখনো ঘুম ভাঙেনি। সে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করেছে। আজই দুপুরে সে খড়গপুর ফিরে যাবে।

বাইরে একটা ট্যাক্সি থামার আওয়াজ পেয়ে মিস্টার সান্যাল হাত থেকে কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই শুরু হল।' শুরুতেই যে শেষ সেটা শরদিন্দু সান্যাল ভাবতে পারেননি।

'বাবা!'

একী, এ যে বাবলুর গলা!

শরদিন্দু সান্যালের দৃষ্টি পর্দাওয়ালা বাইরের দরজাটার দিকে চলে গেল। তার ঠিক পরেই পর্দা ফাঁক করে বাবলু এসে ঢুকল ঘরে।

'কী ব্যাপার? কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন? কে আনল তোকে? একী, তোর চুলের এ কী দশা?'

প্রশ্নগুলো এক নিশ্বাসে করে গেলেন শরদিন্দু সান্যাল; এবং করেই একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন—যেন উত্তরগুলো জানাটা বড় কথা নয়, ছেলে ফিরে এসেছে সেটাই বড়।

তারপরেই তাঁর চোখ গেল বাবলুর পাশে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। 'আপনি ভেতরে আসুন,' বললেন মিস্টার সান্যাল। যেই হোক না কেন, ভিতরে ডাকতেই হবে; একটা পুরস্কারের ব্যাপার আছে তো।

লোকটা দরজার দিকে এগিয়ে এল। মিস্টার সান্যাল রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'দারোয়ানকে বলে দিন বাচ্চা ছেলে সঙ্গে করে কেউ এলে যেন ঢুকতে না দেয়। বলুন যেন বলে দেয় যে ছেলে ফিরে এসেছে।'

রজনীবাবু হুকুম তামিল করতে চলে গেলেন। পর্দা ফাঁক হতেই মিস্টার সান্যাল দেখলেন যে, লোকটা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

একে ভদ্রলোক বলা যায় কি? মিস্টার সান্যাল ভেবে স্থির করলেন—না, যায় না। শার্টটা সস্তা এবং ময়লা, পায়ের চটিটা ক্ষয়ে গেছে, সাদা সুতির প্যান্টটায় অজস্র ভাঁজ। আর ও-রকম চুল আর ঝুলপি—না, ওগুলোকে অভদ্র বলা মুশকিল, কারণ তার নিজের সেজো ছেলে প্রীতীন্দ্রর চুল আর ঝুলপিও তো কতকটা ওইরকমই।

'ভেতরে এস।'

হারুন চৌকাঠ পেরিয়ে এল।

'কী নাম তোমার ?'

'ও হারুনদা, বাবা। আর্টিস্ট। দারুণ খেলা দেখায়।'

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর সদ্য-ফিরে-পাওয়া ছেলের দিকে একটু বিরক্তভাবেই চেয়ে বললেন, 'তুমি থামো বাবলু। ওকে বলতে দাও। তুমি বরং ওপরে যাও। ঠামাকে গিয়ে বলো, তুমি ফিরে এসেছ—বড় কষ্ট পেয়েছেন এ ক'টা দিন। আর ছোড়দাও আছে। ঘুমোচ্ছে। ওকে তুলে দাও গিয়ে।'

বাবলুর কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই। হারুনদাকে ফেলে সে যাবে কী করে ? ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বাবার চোখের আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাবলু। ও হারুনদাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর পিছন দিকটা।

শরদিন্দু সান্যাল আবার লোকটার দিকে চাইলেন।

'শুনি তোমার ব্যাপার।'

'ও খড়গপুর থেকে আমার সঙ্গে এসেছে। চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিল। আমি টেনে তুলি। তারপর থেকে এখানেই ছিল।'

'এখানে মানে ?'

'কলকাতায় বেনটিং ইস্ট্রীটে। একটা চায়ের দোকানে।'

'চায়ের দোকানে ?' মিস্টার সান্যালের চোখ কপালে উঠে গেছে। 'কী করছিল চায়ের দাকানে ?'

'কাজ করছিল স্যার ?'

'কাজ ? কী কাজ ?' মিস্টার সান্যাল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করছেন না।

হারুন বলল। মিস্টার সান্যালের মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে, থাকলে বোধহয় বেশ কয়েক গাছা ছিঁড়ে ফেলতেন।

'হোয়াট ইজ অল্ দিস !' চেয়ার ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার সান্যাল—'এ কি মগের মুল্লুক নাকি ? ওকে দিয়ে চায়ের দোকানের বয়ের কাজ করিয়েছ ? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই ? দেখে বুঝলে না, ও ভদ্রলোকের ছেলে ?'

বাবলু আর থাকতে পারল না। ও বারান্দা থেকে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'আমার খুব ভালো লাগছিল কাজ করতে বাবা !'

'চুপ করো !'—গর্জন করে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। 'তোমাকে বললাম না ওপরে যেতে ?'

বাবলু আবার দরজার বাইরে চলে গেল। অ্যাদ্দিন পরে বাড়িতে ফিরে এসে যে এ-রকম একটা ব্যাপার হবে, সেটা ও ভাবতেই পারেনি।

হারুন এখনো শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, আর শান্তভাবেই সে বলল, 'আমি যদি জানতুম ও কোন্ বাড়ির তাহলে কি আর আমার কাছে রাখতুম স্যার। ও যে বলতে পারলে না। ওর কিছু মনে ছিল না।'

'আর আজ কাগজে বেরোনোমাত্র সব মনে পড় গেল ?'

মিস্টার সান্যাল যে হারুনের কথা মোটেই বিশ্বাস করছেন না, সেটা তাঁর প্রশ্নের সুর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। হারুন কথাটা শুনে একটু অবাক হল।

'কাগজের কথা কী বলছেন জানি না স্যার। ওর মনে পড়েছে কাল রাত্তিরে। কাল বাদলা ছিল তাই আর আনিনি। আজ নিয়ে এলুম, আপনার হাতে তুলে দিলুম—ব্যস্, আমার ডিউটি ফিনিশ। তবে, ইয়ে, ওর মাথার একটা জায়গায় দেখবেন একটু ফোলা আছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। যদি ডাক্তার-ফাক্তার দেখান, তাই জানিয়ে দিলুম। ...চলি রে ফট্‌কে।'

হারুনদা চলে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবলু ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ওকে বাবা ডাকলেন। 'বাবলু, একবার এদিকে এস।'

ও এল। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। শরদিন্দু সান্যাল ছেলের মাথার দিকে হাত বাড়ালেন। 'কোথায় ফোলা রে?'

বাবলু দেখাল। সত্যিই ফোলাটা এখনো পুরোপুরি যায়নি। পাছে ব্যথা লাগে, তাই মিস্টার সান্যাল আর সেখানে হাত দিলেন না।

'খুব কষ্ট হয়েছে এ-ক'দিন?'

ও মাথা নাড়ল। না, হয়নি!

'ওপরে যাও। হরিনাথকে বলো, গরম জলে বেশ করে চান করিয়ে দেবে। আজ তোমার ছুটি। আজ ডাক্তারবাবু এসে তোমাকে দেখবেন। যদি বলেন যে ঠিক আছে, তাহলে কাল থেকে তুমি আবার ইস্কুলে যাবে। এবার থেকে রোজ গাড়িতে। ...যাও।'

ও চলে গেল।

মিস্টার সান্যাল সামনে টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজের স্তূপটা হাতের একটা বিরক্ত ঝাঁটে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'চায়ের দোকান!—ফুঃ!'—তারপর রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'চায়ের দোকান! ভাবতে পার?'

রজনীবাবু কেবল একটা কথাই ভাবছিলেন—যদিও সেটা তাঁর মনিবকে বলা যায় না, কারণ কথাটা তাঁর সম্পর্কেই। তিনি ভাবছিলেন যে, যে-লোকটা বাবলুকে ফেরত দিয়ে গেল, তার খবরের কাগজ না-দেখার সুযোগটা নিয়ে মিস্টার সান্যাল তাকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না।

ঘন্টাখানেক পরে মিস্টার সান্যাল দারোগা মিস্টার চন্দর কাছ থেকে একটা ফোন পেলেন।

'আপনার বিজ্ঞাপনের কোনো ফল পেলেন?' জিজ্ঞেস করলেন দারোগাসাহেব।

উত্তরে মিস্টার সান্যাল যা বললেন তাতে তিনি খুশি তো হলেনই, সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলেন রীতিমতো। বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার স্যার!—এককেটা সময়

আসে যখন মনে হয়, এগোবার বুঝি আর রাস্তা নেই। আবার তারপরেই হঠাৎ দেখবেন, ম্যাজিকের মতো সব রাস্তা খুলে গেছে। আপনার ছেলেও ফিরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্যাঙের দুটি লোকও অ্যারেস্ট হয়ে গেল।'

'সে কী!' বললেন মিস্টার সান্যাল। 'কী করে হল?'

'একটা লোক ফোন করে তাদের ডেরার হদিস দিয়ে দেয়। আধ ঘন্টাও হয়নি, ওদের ঘুম থেকে তুলে ধরে আনা হয়েছে। থানায় এসে ঘুম ছুটে গেছে। পুরো ব্যাপারটা স্বীকার করেছে।'

এই টেলিফোনের দশ মিনিটের মধ্যে বাবলু-চুরির পুরো ব্যাপারটা শরদিন্দু সান্যালের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল।

বাবলুর ঠাকুরমা তাঁর নাতিকে ফিরে পেয়ে কিছুক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে 'ধন আমার মানিক আমার' বলে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ওর ব্যথার জায়গাগুলোতে নতুন করে ব্যথা লাগিয়ে দিয়ে আবার চলে চললেন তাঁর পুজোর ঘরে। গোপালই তাঁর নাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। গোপালের উপর তাঁর ভক্তি তিনগুণ বেড়ে গেছে। বাবলু নতুন করে বুঝেছে যে ঠাম্মার পুজোর ঘন্টা ওর নিজের ঘর থেকে শোনা গেলেও, আসলে ঠাম্মা থাকেন অনেক দূরে।

ছোড়দা আড়াইটের সময় খড়গপুর চলে গেল। সে বলল, 'ভাবতে পারিস, তুই রয়েছিস খড়গপুরে, নিজের নাম বাপের নাম সব ভুলে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছিস, আর আমিও রয়েছি সেই একই শহরে মাইলখানেকের মধ্যে, অথচ কিছুই জানতে পারলাম না। স্কাউন্ড্রেল দুটোকে হাতের কাছে পেলে স্রেফ একটি করে কারাটে চপ—ব্যস্, ওদেরও বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া যেত। ...যাক্, তোকে হোম টাস্ক দিচ্ছি—যা ঘটল তা বেশ গুছিয়ে লিখে ফ্যাল্ তো ইংরিজিতে। তুই তো "এসে"-টেসে বেশ ভালো লিখতিস। লিখে ফ্যাল্। নেক্সট টাইম এসে দেখব।'

এ বাড়িতে বাবলুর নতুন করে দেখার কিছুই নেই। সবই ওর জানা, ওর দেখা। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি বারান্দা, প্রতিটি সিঁড়ির ধাপ। ওর নিজের ঘরে দেয়ালের উপর দিকে একটা জায়গায় ড্যাম্প লেগে নকশা ফুটে উঠেছিল যেটা দেখতে ঠিক যেন আফ্রিকার ম্যাপ। বাবলুর সেটা সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল। এবার ফিরে এসে ঘরে গিয়েই দাগটার দিকে চেয়ে দেখল সেটা বেড়ে ছড়িয়ে অনেকটা উত্তর আমেরিকার মতো হয়ে গেছে।

সাড়ে-তিনটের সময় গোলগাল নাদুস-নুদুস ডক্টর বোস এলেন। বাবলু দেখেছে, তার যখন একশো চার জ্বর হয়েছে তখনো ডাক্তারবাবুর মুখে হাসি। ছোড়দা একবার বলেছিল, ওঁর মুখের মাস্‌লগুলোই নাকি ওইরকম, তাই হাসতে না চাইলেও মুখ হাসি-হাসি দেখায়। হরিনাথ ডাক্তারবাবুর ব্যাগ বয়ে নিয়ে

এল। সঙ্গে রজনীকাকুও ছিলেন, আর চৌকাঠের বাইরে পর্দা ফাঁক করে পুরু চশমার ভিতর দিয়ে দেখছিল ঠামা। বাবা তখনো কোর্ট থেকে ফেরেননি। ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'তোমার দাম কত জান তো বাবলুবাবু ? পাঁচটা তুমি হলেই একটা অ্যামবাসাডর হয়ে যায়—হ্যাঁ-হ্যাঁ !'

বাবলু তখন কথাটার মানে বুঝতে পারেনি। বুঝল, যখন ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ করে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে রজনীকাকুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাগ্যবান পুরুষটি কে মশাই ? পাঁচ হাজার ইজ নো জোক !' —আর রজনীকাকু গলা খাঁকরিয়ে 'ওটা, ইয়ে—লোকটির নামটা...মানে...' বলে থেমে গেলেন। ডাক্তার বোস আর ব্যাপারটা না ঘাঁটিয়ে 'ওয়েল বাবলুবাবু—একদিন এসে তোমার গপ্পো শোনা যাবে কেমন ?'—বলে চলে গেলেন, আর হরিনাথ আর রজনীকাকুও ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে গেল।

বাবলু বুঝতে পারল, বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। ও আজকাল মাঝে মাঝে খবরের কাগজ দেখে—খেলার খবর দেখে, কোথায় কী সিনেমা হচ্ছে দেখে। ও জানে কাগজে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশের খবর বেরোয়। তাতে যে হারিয়েছে তার ছবি থাকে, আর পুরস্কারের কথা থাকে। বাবাও কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নাকি ?

বাবলু নিচে গেল। বাবার আপিস ঘরে থাকে খবরের কাগজ। গিয়ে দেখল, দশটা খবরের কাগজে পাঁচরকম ভাষায় ওর সেই সিনচল লেকের ধারে ছোড়দার তোলা ছবিটা দিয়ে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। হারানো ছেলে নিখিল (ডাকনাম বাবলু) সান্যালের সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

হারুনদা কাগজ পড়েনি, তাই হারুনদা টাকা চায়নি। এই টাকা হারুনদার পাওনা। না চাইলেও পাওয়া উচিত ছিল। বাবার দেওয়া উচিত ছিল। বাবা দেননি।

বাবলুর মনটা এত ভারি হয়ে গেল যে, সে কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসে রইল। বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। টাকাটা পেলে হারুনদা নতুন খেলার জন্য নতুন জিনিস কিনতে পারত, ছোট ঘর ছেড়ে আরেকটু বড় ঘরে গিয়ে থাকতে পারত। হয়তো অনেকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারত। দিব্যি খেয়ে-পরে হেসে-খেলে গান গেয়ে কাটাতে পারত।

হয়তো ও এতক্ষণে কাগজ পড়ে বিজ্ঞাপনটা দেখে ফেলেছে, আর দেখে না জানি কী ভাবছে !

বাবলু বাগান থেকে বেরিয়ে এল। ওই যে বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। চারিদিকে ছড়ানো সোফা, টেবিল, বইয়ের আলমারি, মূর্তি, ছবি,

ফুলদানি। কোনোটাতেই এমন রং নেই যাতে মনটা খুশি হয়। সোফার ঢাকনাগুলো ময়লা হয়ে গেছে, নক্শাগুলো প্রায় বোঝাই যায় না। কেউ বদলায়নি, তাই এই দশা। দিদি থাকলে খেয়াল করে বদলে দিত। এখন কেউ করে না।

বাবলু বেশ কিছুক্ষণ একা একটা সোফায় পা তুলে বসে রইল। দেয়ালের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল। পাশের বাড়ি থেকে ডিউক কুকুরটা একবার ঘেউ করে উঠল। বোধহয় বারান্দা থেকে কোনো রাস্তার কুকুরকে দেখেছে। হারুনদা সেদিন ওকে বলেছিল রাস্তার কুকুর। বাবলুর মনে হল সেটা হলে তাও ভালো ছিল।

॥ ১৪ ॥

সাড়ে-চারটের সময় হরিনাথ চায়ের জন্য বাবলুর খোঁজ করে বুঝতে পারল, খোকাবাবু বাড়ি নেই। তাতে হরিনাথের খুব বেশি ভাবনা হল না, কারণ তিনটে বাড়ি পরেই বাবলুর বন্ধু থাকে। অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি থেকে খোকাবাবু নিশ্চয়ই তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে ; একটু পরেই ফিরে আসবে।

বাবলু তার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু হরিনাথ যার কথা ভাবছে সে-বন্ধু নয়। দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে বাগানের পিছনের পাঁচিল টপকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবলু লাউডন স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট দিয়ে, লোয়ার সার্কুলার রোড পেরিয়ে শেষটায় সি আই টি রোডে পৌঁছে একে ওকে জিজ্ঞেস করে ঠিক হাজির হয়েছিল সেই ব্রিজটাতে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডান দিক বাঁ দিক হিসেব রেখে টিউব কলের ধারে মেয়েদের ভিড় পেরিয়ে একটু যেতেই, কয়েকটি ছেলে তাকে দেখে বলল, 'হারুনদা নেই, হারুনদা চলে গেছে।'

বাবলু চোখে অন্ধকার দেখল।

'কোথায় চলে গেছে ?' সে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল।

এবার একজন লুঙ্গিপরা বুড়ো একটা ঝুরঝুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'হারুনকে খুঁজচ খোকা ? সে আজ মাদ্রাজ যাবে বলে ট্রেন ধরতে গেছে। সার্কাস কোম্পানি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

হাওড়া যাবার জন্য দশ নম্বর বাস ধরতে হবে সেটা বস্তির কয়েকজন ছেলেই বাবলুকে বলে, ওকে ট্রেন লাইন পেরিয়ে একেবারে বাসস্টপে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। উপেনবাবুর দেওয়া আগাম টাকাটা বাবলু সবসময়ই তাঁর প্যান্টের পকেটে রাখত। তার থেকেই বাসভাড়া আর হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টিকিট হয়ে গেল।

হারুনদার গাড়ি ছেড়ে দেয়নি তো ?

'মাদ্রাজের গাড়ি কোন প্ল্যাটফর্মে—মাদ্রাজের গাড়ি ?'

'সাত নম্বর, খোকা, ওই যে ওই দিকে। ওই দ্যাখ নম্বর।'

লম্বা ট্রেনটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে লম্বা পাড়ি দেবে বলে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাবলু এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে চলল। থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস,...ফার্স্ট ক্লাস...লোকজন মাল কুলি বাক্স-প্যাটরা হোল্ডল পুঁটলি সব ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে একটা জায়গায় এসে বাবলু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

একটা চায়ের দোকানের পাশে লোকে ভিড় করেছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিনটে চায়ের কাপ শূন্যে লাফ মারছে, আর লোকগুলো হো-হো করে উঠছে, হাততালি দিচ্ছে।

গাড়ি ছাড়তে কিছু দেরি, তাই হারুনদা খেলা দেখাচ্ছে।

বাবলু ভিড় ঠেলে হারুনদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এ কী, তুই এখানে ?'

হাততালির জন্য হারুনদাকে বেশ চেঁচিয়ে বলতে হল কথাটা। তারপর কাপ তিনটে দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে হারুন আবার বাবলুর দিকে ফিরল।

'আমার ওখানে গেসলি বুঝি ? ওরা বলে দিল "আমি নেই" ?'

ও কিছু বলছে না দেখে হারুনই বলে চলল, 'সেদিন তোকে মাদ্রাজের সেই ভেঙ্কটেশের চিঠিটার কথা বলছিলাম না ?—ভেবে দেখলাম, মওকাটা ছাড়া উচিত হবে না। ওখানে চোখ বেঁধে এক চাকার সাইকেল চালাতে চালাতে জাগ্‌লিং দেখাতে হবে। কম-সে-কম মাসখানেক প্র্যাকটিস লাগবে। তাই একটু আগে যাওয়া ভালো।'

ও টাকাটার কথা বলতে গিয়েও পারল না। হারুনদা একটা নতুন সুযোগ পেয়েছে—হয়তো অনেক বেশি রোজগার করবে। আর ওকে দেখেও মনে হচ্ছে ও ফুর্তিতে আছে। যদি টাকাটার কথা বললে ওর মন খারাপ হয়ে যায় !

ওর নিজের মন খারাপের কথাটাও বলতে হল না, কারণ হারুনদা বুঝে ফেলেছে।

'বাড়িতে ভাল্লাগছে না তো ?'

'না হারুনদা।'

'ফট্‌কেটা জ্বালাছে, তাই তো ? বলছে, উপেনদার দোকানে ইস্কুল করতে হত না, কতরকম লোক দেখা যেত—হারুনদা কতরকম খেলা দেখাত, কলকাতার রাস্তার দিয়ে কেমন হেঁটে বেড়াতাম দু'জনে—তাই তো ?'

সব ঠিক বলেছে হারুনদা। ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হারুন বলল,

'ফট্‌কেটাকে একটু ধমক না দিলে ও তোকে লেখাপড়া করতে দেবে না। সেটা কোনো কাজের কথা নয়। কত আপসোস হয় আমার জানিস—আরো পড়িনি বলে ?'

'তাও তো তুমি এত ভালো খেলা দেখাও। তুমি তো আর্টিস্ট।'

'আর্টিস্ট কি শুধু একরকম হয় ? তোদের বাড়ির মতো বাড়িতে থেকে কি আর্টিস্ট হওয়া যায় না ? লেখাপড়া করে আর্টিস্ট হয় না ? শুধু বলের খেলাতেই কি আর্টিস্ট ? বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা—কতরকম খেলা আর কতরকম আর্টিস্ট হয় জানিস ? যখন বড় হবি তখন জানতে পারবি, কোন্ খেলাটা কী স্টাইলে খেলতে হবে তোকে। তখন তুই—'

ও আর পারল না। গার্ড হুইসল দিয়ে দিয়েছে। ওকে বলতেই হবে কথাটা। ও হারুনদার কথার উপরেই চিৎকার করে বলল, 'বাবা তোমায় টাকা দেয়নি হারুনদা। পাঁচ হাজার টাকা ! তুমি না নিয়েই চলে যাবে ?'

হারুন ওর কামরার পা-দানিতে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে হেসে বলল, 'তোর ছবিটা ও-রকম হয়েছে কেন ? মনে হচ্ছে খোক্কসের ছা।'

হারুনদা জানে ! ও কাগজ দেখেছে !

ট্রেনের ভোঁ বেজে উঠল। ও হারুনদার কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হারুন বলল, 'তোর বাবাকে বলিস, হারুনদা বলেছে ওঁর ছেলেকে ফেরত দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাইকে বিক্রি করে কেউ টাকা নেয় ?'

গাড়ি ছেড়ে দিল। ও কিছু ভাবতে পারছে না। ও শুনছে হারুনদা চেঁচিয়ে বলছে, 'গ্রেট ডায়মন্ড সার্কাস—এলে দেখতে যাস—এক চাকার সাইকেলে চোখ বেঁধে বলের খেলা !'

'এখানে আসবে হারুনদা ?'

ও ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। বেশিক্ষণ পারবে না।

'আসতেই হবে ! সার্কাসের কদর কলকাতায় সবচেয়ে বেশি। দেশের সব শহরের মধ্যে !'

হারুনদা হাত নাড়ছে।

হারুনদা দূরে চলে যাচ্ছে।

হারুনদা মিলিয়ে গেল।

ট্রেন চলে গেল।

ওই যে সবুজ গোল আলো। ওটাকে বলে সিগন্যাল। বাবলু এখন জানে। ওর মানে লাইন ক্লিয়ার।

হাতের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে বাবলু বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দুটো কাঠের

বল ওর পকেটে। আর, একটা মানুষ—যাকে ও খুব ভালো করে চেনে—যাকে দিয়ে ওর অনেক কাজ হবে—তাকে ও মনের এক কোনায় পুরে রেখে দেবে।

তার নাম শ্রীফটিকচন্দ্র পাল।

অনাথবাবুর ভয়

অনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ট্রেনের কামরায়। আমি যাচ্ছিলাম রঘুনাথপুর হাওয়াবদলের জন্য। কলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। গত ক-মাস ধরে কাজের চাপে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাছাড়া আমার লেখার শখ, দু-একটা গল্পের প্লটও মাথাও ঘুরছিল, কিন্তু এত কাজের মধ্যে কি আর লেখার ফুরসত জোটে ? তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে দশদিনের পাওনা ছুটি আর দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এত জায়গা থাকতে রঘুনাথপুর কেন তারও অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ওখানে বিনা-খরচায় থাকার একটা ব্যবস্থা জুটে গেছে। আমার কলেজের সহপাঠী বীরেন বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে রঘুনাথপুরে। কফি হাউসে বসে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়, এই আলোচনাপ্রসঙ্গে বীরেন খুব খুশি হয়ে ওর বাড়িটা অফার করে বলল, 'আমিও যেতুম, কিন্তু আমার এদিকের ঝামেলা, বুঝতেই তো পারছিস। তবে তোর কোনোই অসুবিধা হবে না। আমাদের পঞ্চাশ বছরের পুরনো চাকর ভরদ্বাজ রয়েছে ও-বাড়িতে। ও-ই তোর দেখাশুনো করবে। তুই চলে যা।'

গাড়িতে যাত্রী ছিল অনেক। আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসে ছিলেন অনাথবন্ধু মিত্র। বেঁটেখাটো মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক আন্দাজ বয়স। মাঝখানে টেরিকাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ, আর ঠোঁটের কোণে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচেকানাচে সদাই কোনো মজার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম : ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি যেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনো নাটকের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসেছেন। ওরকম কোট, ও ধরনের শার্টের কলার, ওই চশমা, আর বিশেষ করে ওই বুট জুতো—এসব আর

আজকালকার দিনে কেউ পরে না।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কিংবা এও হতে পারে যে ট্রেনের শব্দের জন্য তিনি আমার প্রশ্ন শুনতে পাননি।

বীরেনের পৈতৃক ভিটেটি দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। বেশ বাড়ি। সামনে একফালি জমি—তাতে সবজি ও ফুলগাছ দুই-ই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোনো বাড়িও নেই, কাজেই পড়শীর উৎপাত থেকেও রক্ষা।

আমি আমার থাকার জন্য ভরদ্বাজের আপত্তি সত্ত্বেও ছাতের চিলেকোঠাটি বেছে নিলাম। আলো বাতাস এবং নির্জনতা, তিনটেই অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে ওখানে। ঘর দখল করে জিনিসপত্র গোছাবার সময় দেখি আমার দাড়ি কামানোর ক্ষুর আনতে ভুলে গিয়েছি। ভরদ্বাজ শুনে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে খোকাবাবু। এই তো কুণ্ডুবাবুর দোকান, পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই পাবে'খন বিলেড।'

বিকেল চারটে নাগাদ চা-টা খেয়ে কুণ্ডুবাবুর দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি সেটি একটি ভালো আড্ডার জায়গা। দোকানের ভিতর দুটি বেঞ্চিতে বসে পাঁচ-সাতটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমতো গল্প জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিতভাবে বলছেন, 'আরে বাপু, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। আর তিরিশ বছর হয়ে গেল বলেই কি সব মন থেকে মুছে গেল? এসব স্মৃতি অত সহজে ভোলবার নয়, আর বিশেষ করে যখন হলধর দত্ত ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মৃত্যুর জন্য আমি যে কিছু অংশে দায়ী, সে বিশ্বাস আমার আজও যায়নি।'

আমি এক প্যাকেট সেভন-ও-ক্লক কিনে আরো দু-একটা অবান্তর জিনিসের খোঁজ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, 'ভেবে দেখুন, আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গে মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাতে গেল ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না, ফেরে না, ফেরে না—শেষটায় আমি, জিতেন বক্সি, হরিচরণ সা, আর আরো তিন-চারজন কে ছিল ঠিক মনে নেই—গেলুম হালদারবাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছেন, তাঁর চোখ চাওয়া, দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যা নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কী ভাবব বলুন? গায়ে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আঁচড় নেই, সাপের ছোবল নেই, কিচ্ছু নেই। আপনারাই বলুন এখন কী বলবেন।'

আরো মিনিট পাঁচেক দোকানে থেকে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল। ব্যাপারটা এই—রঘুনাথপুরের দক্ষিণপ্রান্তে হালদারবাড়ি বলে

একটি দুশো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় জমিদারী প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে—বিশেষ করে তার দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে—নাকি অনেক কালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায়নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের অস্তিত্ব মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে। আর বিশ্বাস করার কারণও আছে যথেষ্ট। একে তো হলধর দত্তের রহস্যজনক মৃত্যু, তার উপর এমনিতেই হালদারবংশের ইতিহাসে নাকি খুনখারাপি, আত্মহত্যা ইত্যাদির অনেক নজির পাওয়া যায়।

মনে মনে হালদারবাড়ি সম্পর্কে বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দোকানের বাইরে এসেই দেখি আমার ট্রেনের আলাপী অনাথবন্ধু মিত্র মশাই হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন, 'শুনছিলেন ওদের কথাবার্তা?'

বললাম, 'তা কিছুটা শুনেছি।'

'বিশ্বাস হয়?'

'কী? ভূত?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপার কী জানেন—ভূতের বাড়ির কথা তো অনেকই শুনলাম, কিন্তু সেসব বাড়িতে থেকে নিজের চোখে ভূত দেখেছে এমন লোক তো কই আজ অবধি একটিও মীট করলাম না। তাই ঠিক—'

অনাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'কী?'

'বাড়িটা।'

'দেখে আসব মানে—'

'বাইরে থেকে আর কি। বেশি দূর তো নয়। বড় জোর মাইলখানেক। এই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির ছাড়িয়ে ডানহাতি রাস্তায় ঘুরে পোয়াটাক পথ।'

ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আর তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করব? তাই চললাম তাঁর সঙ্গে।

হালদারদের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে বাড়ির গেটের মাথাটি দেখা যেতে থাকে পৌঁছনোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক, মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা। ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকদূর রাস্তা গিয়ে তবে সদর দালান। দু-তিনটে মূর্তি আর ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ দেখে বুঝলাম যে বাড়ির আর ফটকের

মাঝখানের এই জায়গাটা আগে বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোনো বাহার নেই তার কোনো জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকোচৌকো ভাব। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে তার শেওলাবৃত দেয়ালে।

মিনিটখানেক চেয়ে থাকার পর অনাথবাবু বললেন, 'আমি যতদূর জানি, রোদ থাকতে ভূত বেরোয় না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'একবার চট করে সেই ঘরটা দেখে এলে হত না?'

'সেই উত্তর-পশ্চিমের ঘর? যে ঘরে—'

'হ্যাঁ। যে ঘরে হলধর দত্তের মৃত্যু হয়েছিল।'

ভদ্রলোকের তো এসব ব্যাপারে দেখছি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ!

অনাথবাবু বোধহয় আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, না? আসলে কী জানেন? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমার রঘুনাথপুর আসার একমাত্র কারণই হল ওই বাড়িটা।'

'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যে ভূতের বাড়ি, আমি কলকাতায় থাকতে সে খবরটা পেয়ে ওই ভূতটিকে দেখব বলে এখানে এসেছি। আপনি সেদিন ট্রেনে আমার আসার কারণটা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর না দিয়ে অভদ্রতা করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম যে উপযুক্ত সময় এলে—অর্থাৎ আপনি কীরকম লোক সেটা আরেকটু জেনে নিয়ে, আসল কারণটা নিজে থেকেই বলব।'

'কিন্তু তাই বলে ভূতের পেছনে ধাওয়া করে একেবারে কলকাতা ছেড়ে—'

'বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। আমার কাজটা সম্বন্ধেই তো বলা হয়নি এখনো আপনাকে। আসলে আমি ভূত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। আজ পঁচিশ বছর ধরে এ-ব্যাপার নিয়ে বিস্তর রিসার্চ করেছি। শুধু ভূত কেন—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্ফ, ভুডুইজম ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে বইয়ে যা লেখে তার প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে এইসব বই পড়ার জন্য। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে লন্ডনের প্রফেসার নর্টনের সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে চিঠি লেখালেখি করছি। আমার লেখা প্রবন্ধ বিলেতের সব নামকরা কাগজে বেরিয়েছে। আপনার কাছে বড়াই করে কী লাভ, তবে এটুকু বলতে পারি যে এদেশে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক বোধহয় আর নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে তিনি যে মিথ্যে বলছেন বা বাড়িয়ে বলছেন এটা আমার একবারও মনে হয় না। বরং তাঁর সম্বন্ধে খুব সহজেই একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

অনাথবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভারতবর্ষের অন্তত তিনশো ভূতের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। আর সেসব কীরকম কীরকম জায়গায় জানেন? এই ধরুন—জব্বলপুর, কার্সিয়ং, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, কাটোয়া, যোধপুর, আজিমগঞ্জ, হাজারিবাগ, সিউড়ি, বারাসাত, আর কত চাই? ছাপ্পান্নোটা ডাকবাংলো আর কম করে ত্রিশটা নীলকুঠিতে আমি রাত্রি যাপন করেছি। এ ছাড়া কলকাতা এবং তার কাছাকাছির মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানা বাড়ি তো আছেই। কিন্তু—'

অনাথবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভূত আমায় ফাঁকি দিয়েছে। হয়তো, ভূতকে যারা চায় না, ভূত তাদের কাছেই আসে। আমি বার বার হতাশ হয়েছি। মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লীতে দেড়শ বছরের পুরনো একটা সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্লাব-বাড়িতে ভূত একবার কাছাকাছি এসেছিল। কীরকম জানেন? অন্ধকার ঘর, একফোঁটা বাতাস নেই, যতবারই মোমবাতি ধরাব বলে দেশলাই জ্বালাচ্ছি, ততবারই কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষটায় তেরোটা কাঠি নষ্ট করার পর বাতি জ্বলল, এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতবাবাজী সেই যে গেলেন আর এলেন না। একবার কলকাতায় ঝামাপুকুরের এক হানাবাড়িতেও একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার মাথায় তো এত চুল দেখছেন? অথচ, ওই বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মাঝরাত্তির নাগাদ হঠাৎ ব্রহ্মতালুর কাছটায় একটা মশার কামড় খেলাম। কী ব্যাপার? অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটি চুলও নেই! একেবারে মসৃণ মাথাজোড়া টাক! এ কি আমারই মাথা, না অন্য কারুর মাথায় হাত দিয়ে নিজের মাথা বলে মনে করেছি? কিন্তু মশার কামড়টা তো আমিই খেলাম। টর্চটা জ্বেলে আয়নায় দেখি টাকের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। আমার যে-চুল সে-চুলই রয়েছে আমার মাথায়। ব্যস, এই দুটি ছাড়া আর কোনো ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হয়নি। তাই ভূত দেখার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম, এমন সময় একটা পুরনো বাঁধানো "প্রবাসী"তে রঘুনাথপুরের এই বাড়িটার একটা উল্লেখ পেলাম। তাই ঠিক করলাম একটা শেষ চেষ্টা দিয়ে আসব।'

অনাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে কখন যে বাড়ির সদর দরজায় এসে পড়েছি সে খেয়াল ছিল না। ভদ্রলোক তাঁর ট্যাঁকঘড়িটা দেখে বললেন, 'আজ পাঁচটা একত্রিশে সূর্যাস্ত। এখন সোয়া পাঁচটা। চলুন, রোদ থাকতে থাকতে একবার ঘরটা দেখে আসি।'

ভূতের নেশাটা বোধহয় সংক্রামক, কারণ আমি অনাথবাবুর প্রস্তাবে কোনো

আপত্তি করলাম না। বরঞ্চ বাড়ির ভিতরটা, আর বিশেষ করে দোতলার ওই ঘরটা দেখার জন্য বেশ একটা আগ্রহ হচ্ছিল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি বিরাট উঠোন ও নাটমন্দির। একশো-দেড়শো বছরে কত উৎসব, কত অনুষ্ঠান, কত পূজা-পার্বণ, যাত্রা, কথকতা এইখানে হয়েছে, তার কোনো চিহ্ন আজ নেই।

উঠোনের তিন দিকে বারান্দা। আমাদের ডাইনে বারান্দার যে অংশ, তাতে একটি ভাঙা পালকি পড়ে আছে, এবং পালকিটি ছাড়িয়ে হাত দশেক গিয়েই দোতলায় যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়িটা এমনই অন্ধকার যে উঠবার সময় অনাথবাবুকে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি টর্চ বার করে জ্বালতে হল। প্রায়-অদৃশ্য মাকড়সার জালের ব্যূহ ভেদ করে কোনোরকমে দোতলায় পৌঁছনো গেল। মনে মনে বললাম, এ বাড়িতে ভূত থাকা অস্বাভাবিক নয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিসাব করে দেখলাম বাঁ দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে ওই যে ঘর, ওটাই হল উত্তর-পশ্চিমের ঘর। অনাথবাবু বললেন, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন এগোই।'

এখানে বলে রাখি, বারান্দায় কেবল একটি জিনিস ছিল—সেটি একটি ঘড়ি। যাকে বলে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়—কাঁচ নেই, বড় কাঁটাটিও উধাও, পেন্ডুলামটি ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে।

উত্তর-পশ্চিমের ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। অনাথবাবু যখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সন্তর্পণে ঠেলে দরজাটি খুলছিলেন, তখন বিনা কারণেই আমার গা-টা ছমছম করছিল।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করলাম না। দেখে মনে হয় এককালে বৈঠকখানা ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল, তার কেবল পায়া চারখানাই রয়েছে, উপরের তক্তাটা নেই। টেবিলের পাশে জানালার দিকে একটি আরামকেদারা। অবিশ্যি এখন আর সেটি আরামদায়ক হবে কিনা সন্দেহ, কারণ তার একটি হাতল ও বসবার জায়গায় বেতের খানিকটা অংশ লোপ পেয়েছে।

উপরের দিকে চেয়ে দেখি ছাত থেকে ঝুলছে একটি টানাপাখার ভগ্নাংশ। অর্থাৎ, তার দড়ি নেই, কাঠের ডাণ্ডাটা ভাঙা এবং ঝালরের অর্ধেকটা ছেঁড়া।

এ ছাড়া ঘরে আছে একটি খাঁজকাটা বন্দুক রাখার তাক, একটি নলবিহীন গড়গড়া, আর দু'খানা সাধারণ হাতলভাঙা চেয়ার।

অনাথবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা অনুভব করার চেষ্টা করলেন। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললেন,

'একটা গন্ধ পাচ্ছেন?'

'কী গন্ধ?'

'মাদ্রাজী ধূপ, মাছের তেল, আর মড়াপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ।'

আমি বার দু'-এক বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস টানলাম। অনেকদিনের বন্ধ ঘর খুললে যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, সে গন্ধ ছাড়া কোনো গন্ধই পেলাম না। তাই বললাম, 'কই, ঠিক বুঝতে পারছি না তো।'

অনাথবাবু আরো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বহুত আচ্ছা! এ গন্ধ আমার চেনা গন্ধ। এ বাড়িতে ভূত অবশ্যম্ভাবী। তবে বাবাজী দেখা দেবেন কি না-দেবেন সেটা কাল রাত্রের আগে বোঝা যাবে না। চলুন।'

অনাথবাবু স্থির করে ফেললেন যে, পরদিনই তাঁকে এ ঘরে রাত্রিবাস করতে হবে। ফেরার পথে বললেন, 'আজ থাকলুম না কারণ কাল অমাবস্যা—ভূতের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তিথি। তাছাড়া দু'-একটি জিনিস সঙ্গে রাখা দরকার। সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে, কাল নিয়ে আসব। আজ সার্ভেটা করে গেলুম আর কি।'

ভদ্রলোক আমায় বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর কাউকে আমার এই প্ল্যানের কথা বলবেন না যেন। এদের কথাবার্তা তো শুনলুম আজকে—যা ভয় আর যা প্রেজুডিস এদের, জানলে পরে হয়তো বাধাটাধা দিয়ে আমার প্ল্যানটাই ভেস্তে দেবে। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললুম না বলে কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার, বুঝলেন কিনা, একা না হলে ঠিক জুতসই হয় না।'

পরদিন দুপুরে কাগজকলম নিয়ে বসলেও লেখা খুব বেশিদূর এগোল না। মন পড়ে রয়েছে হালদারবাড়ির ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটায়। আর রাত্রে অনাথবাবুর কী অভিজ্ঞতা হবে সেই নিয়ে একটা অশান্তি আর উদ্বেগ রয়েছে মনের মধ্যে।

বিকেলে অনাথবাবুকে হালদারবাড়ির ফটক অবধি পৌঁছে দিলাম। ভদ্রলোকের গায়ে আজ একটা কালো গলাবন্ধ কোট, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক আর হাতে সেই কালকের তিন সেলের টর্চ। ফটক দিয়ে ঢুকবার আগে কোটের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে দুটো বোতল বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন—এটিতে রয়েছে আমার নিজের ফরমুলায় তৈরি তেল—শরীরের অনাবৃত অংশে মেখে নিলে আর মশা কামড়াবে না। আর এই দ্বিতীয়টিতে হল

কারবলিক অ্যাসিড, ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্ত।' এই বলে বোতল দুটো পকেটে পুরে, টর্চটা মাথায় ঠেকিয়ে আমায় একটা সেলাম ঠুকে ভদ্রলোক বুট জুতো খটখটিয়ে হালদারবাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে ভালো ঘুম হল না।

ভোর হতে না হতে ভরদ্বাজকে বললাম আমার থার্মস ফ্লাস্কে দু'জনের মতো চা ভরে দিতে। চা এলে পর ফ্লাস্কটি নিয়ে আবার হালদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

হালদারবাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে দেখি চারিদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। অনাথবাবুর নাম ধরে ডাকব, না সটান দোতলায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম—'ও মশাই, এই যে এদিকে।'

এবার দেখতে পেলাম অনাথবাবুকে—প্রাসাদের পুবদিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হয় না যে রাত্রে তাঁর কোনো ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে হাতে একটা নিমের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই! আধ ঘন্টা ধরে বনেবাদাড়ে ঘুরছি এই নিমডালের খোঁজে। আমার আবার দাঁতনের অভ্যেস কিনা।'

ফস করে রাত্রের কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। বললাম, 'চা এনেছি। এখানেই খাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

'চলুন না, ওই ফোয়ারার পাশটায় বসে খাওয়া যাক।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করে আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে অনাথবাবু বললেন, 'খুব কৌতূহল হচ্ছে, না?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, তা একটু—'

'বেশ। তবে বলছি শুনুন। গোড়াতেই বলে রাখি—এক্সপিডিশন হাইলি সাক্সেসফুল। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে।' অনাথবাবু এক মগ চা শেষ করে দ্বিতীয় মগ ঢেলে তাঁর কথা শুরু করলেন:

'আপনি যখন আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন তখন পাঁচটা। আমি বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে এই আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিলুম। অনেক সময় ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ বা জানোয়ার থেকে উপদ্রবের আশঙ্কা বেশি থাকে। যাই হোক, দেখলুম কাছাকাছির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

'বাড়িতে ঢুকে একতলার ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো খোলা হয়েছে সেগুলোও একবার দেখে নিলুম। জিনিসপত্তর তো আর অ্যাদ্দিন ধরে বিশেষ পড়ে থাকার

কথা নয়। একটা ঘরে কিছু আবর্জনা, আর আরেকটার কড়িকাঠে গুটি চারেক ঝুলন্ত বাদুড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বাদুড়গুলো আমায় দেখেও নড়ল না। আমিও তাদের ডিসটার্ব করলুম না।

'সাড়ে ছ'টা নাগাদ দোতলার ওই আসল ঘরটিতে ঢুকে রাত কাটানোর আয়োজন শুরু করলুম। একটা ঝাড়ন এনেছিলুম, তাই দিয়ে প্রথম আরামকেদারাটিকে ঝেড়েপুঁছে সাফ করলুম। কদ্দিনের ধুলো জমেছিল তাতে কে জানে?

'ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব ছিল, তাই জানালাটা খুলে দিলুম। ভূতবাবাজী যদি সশরীরে আসতে চান তাই বারান্দার দরজাটাও খোলা রাখলুম। তারপর টর্চ ও ফ্লাস্কটা মেঝেতে রেখে ওই বেতছেঁড়া আরামকেদারাতেই শুয়ে পড়লুম। অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশ, কিন্তু এর চেয়েও আরো অনেক বেয়াড়া অবস্থায় বহুবার রাত কাটিয়েছি, তাই কিছু মাইন্ড করলুম না।

'আশ্বিন মাস, সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেই সঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা এক্সাইটেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভেতরে ভেতরে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।

'সময়টা ঠিক বলতে পারি না, তবে আন্দাজে মনে হয় ন'টা কি সাড়ে ন'টা নাগাদ জানালা দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকেছিল। সেটা মিনিটখানেক ঘোরাঘুরি করে আবার জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'তারপর কখন যে শেয়াল, ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, আর কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই।

'ঘুমটা ভাঙল একটা শব্দে। ঘড়ির শব্দ। ঢং ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। মিঠে অথচ বেশ জোর আওয়াজ। জাত ঘড়ির আওয়াজ, আর সেটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমটা ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আরো দুটো জিনিস লক্ষ করলুম। এক—আমি আরামকেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেঁড়াটা তো নেইই, বরং উলটে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আর দুই—আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালর সমেত আস্ত নতুন টানাপাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি দুলিয়ে আমায় চমৎকার বাতাস করছে।

'আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ ফিরে দেখি কে জানি একটি আলবোলা রেখে গেছে, আর তার থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।'

অনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বেশ মনোরম পরিবেশ নয় কি ?'

আমি বললাম, 'শুনে তো ভালোই লাগছে। আপনার রাতটা তাহলে মোটামুটি আরামেই কেটেছে ?'

আমার প্রশ্ন শুনে অনাথবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, 'তাহলে কি সত্যি আপনার কোনো ভয়ের কারণ ঘটেনি ? ভূত কি আপনি দেখেননি ?'

অনাথবাবু আবার আমার দিকে চাইলেন। এবার কিন্তু আর ঠোঁটের কোণে সে হাসিটা নেই। ধরা গলায় ভদ্রলোকের প্রশ্ন এল, 'পরশু যখন আপনি ঘরটায় গেলেন, তখন কড়িকাঠের দিকটা ভালো করে লক্ষ করেছিলেন কি ?'

আমি বললাম, 'তেমন ভালো করে দেখিনি বোধহয়। কেন বলুন তো ?'

অনাথবাবু বললেন, 'ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে, সেটা না দেখলে ঘটনাটা বোঝাতে পারব না। চলুন।'

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনাথবাবু কেবল একটি কথা বললেন, 'আমার আর ভূতের পেছনে ধাওয়া করতে হবে না সীতেশবাবু। কোনোদিনও না। সে শখ মিটে গেছে।'

বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম সেরকমই ভাঙা অবস্থা।

ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে অনাথবাবু বললেন, 'চলুন।'

দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর দু'পা এগিয়ে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরন খেলে গেল।

বুট জুতো পরা ও কে পড়ে আছে মেঝেতে ?

আর বারান্দার দিক থেকে কার অট্টহাসি হালদারবাড়ির আনাচেকানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে ? তাহলে কি— ?

আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ভরদ্বাজ আমার খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ভবতোষ মজুমদার। আমায় চোখ খুলতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'ভাগ্যে সিধুচরণ আপনাকে দেখেছিল ও

বাড়িতে ঢুকতে, নইলে যে কী দশা হত আপনার জানি না। ওখানে গেস্লেন কোন্ আক্কেলে ?'

আমি বললাম, 'অনাথবাবু যে রাত্রে—'

ভবতোষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর অনাথবাবু ! কাল যে অতগুলো কথা বললুম সেসব বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করেননি ভদ্রলোক। ভাগ্যে আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাতে যাননি ও বাড়িতে। দেখলেন তো ওঁর অবস্থা। হলধরের যা হয়েছিল, এঁরও ঠিক তাই। মরে একেবারে কাঠ, আর চোখ ঠিক সেইভাবে চাওয়া, সেই দৃষ্টি, সেই কড়িকাঠের দিকে। ...'

আমি মনে মনে বললাম, না, মরে কাঠ নয়। মরে কী হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে—গায়ে কালো কোট, পায়ে বুট জুতো—হালদারবাড়ির পুব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন।

বাতিকবাবু

বাতিকবাবুর আসল নামটা জিজ্ঞেস করাই হয়নি। পদবী মুখার্জি। চেহারা একবার দেখলে ভোলা কঠিন। প্রায় ছ' ফুট লম্বা, শরীরে চর্বির লেশমাত্র নেই, পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা, হাতে পায়ে গলায় কপালে অজস্র শিরা উপশিরা চামড়া ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। টেনিস কলারওয়ালা সাদা শার্ট, কালো ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, সাদা মোজা সাদা কেড্‌স—দার্জিলিঙের গ্রীষ্মকালে এই ছিল তাঁর মার্কামারা পোশাক। এছাড়া তাঁর হাতে থাকত মজবুত লাঠি। বনবাদাড়ে এবড়ো-খেবড়ো জমিতে ঘোরা অভ্যাস বলেই হয়তো লাঠিটার প্রয়োজন হত।

আমার সঙ্গে বাতিকবাবুর আলাপ দশ বছর আগে। কলকাতায় ব্যাঙ্কে চাকরি করি, দিন দশেকের ছুটি জমেছে, বৈশাখের মাঝামাঝি গিয়ে হাজির হলাম আমার প্রিয় দার্জিলিঙ শহরে। আর প্রথম দিনই দর্শন পেলাম বাতিকবাবুর। কী করে সেটা হল বলি।

চা খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়েছি বিকেল সাড়ে চারটায়। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আবার কখন হবে বলা যায় না, তাই রেনকোটটা গায়ে দিয়েই বেরিয়েছি। দার্জিলিঙের সবচেয়ে মনোরম, সবচেয়ে নিরিবিলি রাস্তা জলাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা মোড়ের মাথায় একটি ভদ্রলোক রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠির উপর ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারী মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছেন। দৃশ্যটা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। জংলি ফুল বা পোকামাকড় সম্বন্ধে আগ্রহ থাকলে লোক ওইভাবে ঘাসের দিকে চেয়ে থাকতে পারে। আমি ভদ্রলোকের দিকে একটা মৃদু কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে আবার এগোতে শুরু করলাম।

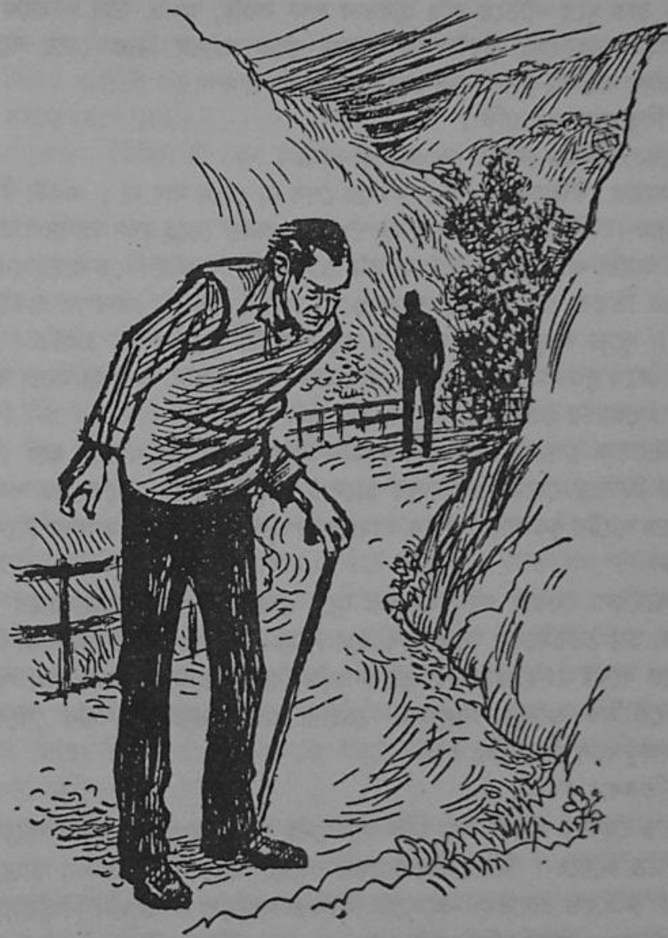

কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মনে হল ব্যাপারটাকে যতটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল ততটা নয়। অবাক লাগল ভদ্রলোকের একাগ্রতা দেখে। আমি পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাবভাব লক্ষ করছি, অথচ, উনি আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সেই একইভাবে সামনে ঝুঁকে ঘাসের দিকে চেয়ে আছেন। শেষটায় বাঙালী বুঝে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'কিছু হারালেন নাকি ?'

কোনো উত্তর নেই। লোকটা কি কালা ?

আমার কৌতূহল বাড়ল। ঘটনার শেষ না দেখে যাব না। একটা সিগারেট ধরালাম। মিনিট তিনেক পরে ভদ্রলোকের অনড় দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হল। তিনি আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে তাঁর ডান হাতটা ঘাসের দিকে বাড়ালেন। ঘন ঘাসের ভিতর তাঁর হাতের আঙুলগুলো প্রবেশ করল। তারপর হাতটা উঠে এল। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে একটা ছোট্ট গোল চাকতি। ভালো করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা বোতাম। প্রায় একটা আধুলির মতো বড়ো। সম্ভবত কোটের বোতাম।

ভদ্রলোক বোতামটা চোখের সামনে এনে প্রায় মিনিটখানেক ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জিভ দিয়ে চারবার ছিক্‌ছিক্‌ করে আক্ষেপের শব্দ করে সেটাকে শার্টের বুকপকেটে পুরে আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ম্যালের দিকে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে ম্যালের মুখে ফোয়ারার ধারে দার্জিলিঙের পুরনো বাসিন্দা ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হল। ইনি কলেজে বাবার সহপাঠী ছিলেন, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁকে আজ বিকেলের ঘটনাটা না বলে পারলাম না। ভৌমিক শুনেটুনে বললেন, 'চেহারা আর হাবভাবের বর্ণনা থেকে তো বাতিকবাবু বলে মনে হচ্ছে।'

'বাতিকবাবু ?'

'স্যাড কেস। আসল নাম ঠিক মনে নেই, পদবী মুখার্জি। বছর পাঁচেক হল দার্জিলিঙে রয়েছে। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছেই একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজে ফিজিক্স পড়াতো। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে। শুনেছি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। চাকরি-বাকরি ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে বোধহয়।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ আছে ?'

'গোড়ার দিকে একবার আমার কাছে এসেছিল। রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে সেপটিক হবার জোগাড়। সারিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু বাতিকবাবু নামটা... ?'

ভৌমিক হো হো করে হেসে উঠলেন। 'সেটা হয়েছে ওর এক উদ্ভট শখের জন্য। অবিশ্যি নামকরণটা কে করেছে বলা শক্ত।'

'শখটা কী ?'

'তুমি তো নিজের চোখে দেখলে—রাস্তা থেকে একটা বোতাম তুলে পকেটে নিয়ে নিল। ওইটেই ওর শখ বা হবি। যেখান সেখান থেকে জিনিস তুলে নিয়ে এসে সযত্নে রেখে দেয়।'

'যে-কোনো জিনিস ?' কেন জানি না, আমার লোকটা সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছিল।

ডাঃ ভৌমিক বললেন, 'আমরা বলব যে-কোনো জিনিস, কিন্তু ভদ্রলোক ক্লেম করবেন সেগুলো অত্যন্ত প্রেশাস, কারণ সে সব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা ঘটনা জড়িয়ে আছে।'

'কিন্তু সেটা উনি জানেন কী করে ?'

ডাঃ ভৌমিক তাঁর হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সেটা তুমি ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না। উনি ভিজিটর পেলে খুশিই হন—কারণ ওঁর গল্পের স্টক প্রচুর। ওঁর কালেকশনের প্রত্যেকটি জিনিসকে নিয়ে একেকটি গল্প তো ! ওয়াইল্ড ননসেন্স, বলা বাহুল্য, তবে উনি সেগুলো বলতে পারলে খুশিই হন। অবিশ্যি তুমি শুনে খুশি হবে কি না সেটা আলাদা কথা...'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছে বাতিকবাবুর বাড়ি চিনে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না, কারণ পাড়ার সকলেই ভদ্রলোককে চেনে। সতের নম্বর বাড়ির দরজায় টোকা মারতেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, এবং আশ্চর্য এই যে আমায় দেখেই চিনলেন।

'কাল আপনি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমার তখন উত্তর দেবার অবস্থা ছিল না। ওই সময়টা কন্‌সেনট্রেশন নষ্ট হতে দিলেই সর্বনাশ। ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল আলমারি। বাঁ দিকের দেয়ালের অর্ধেকটা অংশ জুড়ে একটা কাঁচে ঢাকা আলমারির প্রতিটি তাকে পাশাপাশি রাখা অতি সাধারণ সব জিনিস, যেগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই। একবার চোখ বুলিয়ে একটা শেল্‌ফে পাশাপাশি চোখে পড়ল—একটা গাছের শেকড়, একটা মর্চে ধরা তালা, আদ্যিকালের গোল্ড ফ্লেকের টিন, একটা উল বোনার কাঁটা, একটা জুতোর বুরুশ, একটা টর্চলাইটের ব্যাটারি। আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'ওগুলো দেখে আপনি বিশেষ আনন্দ পাবেন না, কারণ ওসব জিনিসের মূল্য কেবল আমিই জানি।'

আমি বললাম, 'শুনেছি এসব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা বিশেষ ঘটনার

সম্পর্ক রয়েছে ?'

'আছে বৈকি।'

'কিন্তু সেরকম তো সব জিনিসের সঙ্গেই থাকে। যেমন আপনি যে ঘড়িটা হাতে পরেছেন—'

ভদ্রলোক হাত তুলে আমার কথা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'ঘটনা জড়িয়ে থাকে অবশ্যই, কিন্তু সব জিনিসের উপর সে ঘটনার ছাপ থেকে যায় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ একেকটা জিনিস মেলে যার মধ্যে সে ছাপটা থাকে। যেমন কালকের এই বোতামটা—'

ঘরের ডানদিকে একটা রাইটিং ডেস্কের উপর বোতামটা রাখা ছিল। ভদ্রলোক সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খয়েরি রঙের কোটের বোতাম। তার মধ্যে কোনোরকম বিশেষত্ব আমার চোখে ধরা পড়ল না।

'কিছু বুঝতে পারছেন ?'

বাধ্য হয়েই না বলতে হল। বাতিকবাবু বললেন, 'এই বোতাম একটি সাহেবের কোট থেকে এসেছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে জলাপাহাড় রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি, রাইডিং-এর পোশাক পরা, সবল সুস্থ মিলিটারি চেহারা। যেখানে বোতামটা পেলুম, সেইখানটায় এসে ভদ্রলোকের স্ট্রোক হয়। ঘোড়া থেকে পড়ে যান। দুজন পথচারী দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসে, কিন্তু তিনি অলরেডি ডেড। ঘোড়া থেকে পড়ার সময়ই বোতামটা কোট থেকে ছিঁড়ে রাস্তার ধারে পড়ে যায়।'

'এসব কি আপনি দেখতে পান ?'

'ভিভিড্‌লি। যত বেশি মনঃসংযোগ করা যায়, তত বেশি স্পষ্ট দেখি।'

'কখন দেখেন ?'

'এই জাতীয় বিশেষ গুণসম্পন্ন কোনো বস্তুর কাছে এলেই আমি প্রথমে একটা মাথার যন্ত্রণা অনুভব করি। তারপর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, মনে হয় পড়ে যাব, সাপোর্ট দরকার। কিন্তু তারপরেই দৃশ্য দেখা শুরু হয়, আর পাও স্টেডি হয়ে যায়। এই এক্‌সপিরিয়েন্সের ফলে আমার শরীরের টেম্পারেচার বেড়ে যায় প্রতিবার। কাল প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত একশ দুই জ্বর ছিল। অবিশ্যি জ্বরটা বেশিক্ষণ থাকে না। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

ব্যাপারটা আজগুবি হলেও আমার বেশ মজা লাগছিল। বললাম, 'আরো দু-একটা উদাহরণ দিতে পারেন ?'

বাতিকবাবু বললেন, 'আলমারি ভর্তি উদাহরণ। ওই যে খাতা দেখছেন, ওতে প্রত্যেকটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। আপনি কোন্‌টা জানতে চান বলুন।'

আমি কিছু বলার আগে ভদ্রলোক আলমারির কাঁচ সরিয়ে তাক থেকে দুটো জিনিস বার করে টেবিলের উপর রাখলেন—একটা বহু পুরনো চামড়ার দস্তানা, আর একটা চশমার কাঁচ।

'এই যে দস্তানাটা দেখছেন,' বাতিকবাবু বললেন, 'এটা আমার প্রথম পাওয়া জিনিস ; অর্থাৎ আমার সংগ্রহের প্রথম আইটেম। এটা পাই সুইটজারল্যান্ডের লুসার্ন শহরের বাইরে একটা বনের মধ্যে। তখন আমার মারবুর্গে পড়া শেষ হয়েছে, আমি দেশে ফেরার আগে একটু কন্টিনেন্টটা ঘুরে দেখছি। লুসার্নে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছি। নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। একটু বিশ্রাম নেব বলে একটা বেঞ্চিতে বসেছি, এমন সময় পাশেই একটা গাছের গুঁড়ির ধারে ঘাসের ভিতর দস্তানার বুড়ো আঙুলটা চোখে পড়তেই মাথা দপ্‌ দপ্‌ করতে আরম্ভ করল। তারপর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল : তারপর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবি। একটি সুবেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, মুখে লম্বা ব্যাঁকানো সুইস পাইপ। দস্তানা পরা হাতে ছড়ি নিয়ে হেঁটে চলেছেন রাস্তা দিয়ে। আচমকা ঝোপের পিছন থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করল। ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে হাত পা ছুঁড়লেন। ধ্বস্তাধ্বস্তির ফাঁকে তিনি তাঁর ডান হাতের দস্তানাটি হারালেন, দুর্বৃত্তেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর কোটের পকেট থেকে টাকাকড়ি ও হাত থেকে সোনার ঘড়িটি নিয়ে পালাল।'

'সত্যিই এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি ?'

'আমি তিন দিন হাসপাতালে ছিলুম। জ্বর, ডিলিরিয়াম, আর আরো অনেক কিছু। ডাঃ স্টাইনিট্‌স রোগ ধরতে পারেননি। তারপর আপনিই সেরে উঠে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে অনুসন্ধান আরম্ভ করি। দু বছর আগে ওই বনে ঠিক ওই জায়গায় কাউন্ট ফার্ডিনান্ড মুস্যাপ বলে একজন ধনী ব্যক্তি ঠিক ওইভাবেই খুন হয়। তার ছেলে দস্তানাটা চিনতে পারে।'

ভদ্রলোক এমন সহজভাবে ঘটনাটা বলে গেলেন যে তাঁর কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। বললাম, 'আপনি সেই তখন থেকেই আপনার সংগ্রহ শুরু করেন ?'

বাতিকবাবু বললেন, 'এই দস্তানাটা পাবার পর প্রায় দশ বছর আর ও ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। ততদিনে আমি দেশে ফিরে কটকের কলেজে প্রফেসারি আরম্ভ করেছি। ছুটিতে এখানে ওখানে বেড়াতে যেতাম। একবার ওয়ালটেয়ারে গিয়ে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটা হয়। সমুদ্রের তীরে একটা পাথরের খাঁজে এই চশমার কাঁচটা পাই। দেখতেই পাচ্ছেন প্লাস পাওয়ারের কাঁচ। একটি মাদ্রাজি ভদ্রলোক চশমা খুলে রেখে জলে নেমেছিলেন স্নান করতে। তিনি আর জল থেকে ফেরেননি। পায়ে ক্র্যাম্প ধরার ফলে তাঁর সলিল সমাধি

হয়। জলের ভিতর থেকে হাত তুলে হেল্প হেল্প চিৎকার—ভারী মর্মান্তিক। তাঁরই চশমার এই কাঁচটি চার বছর পরে আমি পাই। এটাও যে সত্যি ঘটনা সেটা আমি যাচাই করে জেনেছি। ওয়েল নোন ড্রাউনিং কেস। মৃত ব্যক্তি কোয়েম্বাটোরে থাকতেন, নাম শিবরমণ।'

ভদ্রলোক দস্তানা ও চশমার কাঁচ যথাস্থানে রেখে আবার জায়গায় এসে বসলেন। 'আমার এই আলমারিতে কতগুলো জিনিস আছে জানেন? একশো বাহাত্তরটা। আমার গত ত্রিশ বছরের সংগ্রহ। বলুন তো, এরকম সংগ্রহের কথা আর শুনেছেন কি?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার এই হবিটি যে একেবারে ইউনীক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গেই কি মৃত্যুর একটা সম্পর্ক রয়েছে?'

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাই তো দেখছি। শুধু মৃত্যু নয়—আকস্মিক, অস্বাভাবিক মৃত্যু। খুন, আত্মহত্যা, অপঘাত মৃত্যু, হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া—এই জাতীয় ঘটনার সঙ্গে যোগ থাকলে তবেই এক‌েকটা জিনিস আমার মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।'

'এগুলোর সবই কি রাস্তায় বা মাঠে-ঘাটে পাওয়া?'

'অধিকাংশই। আর বাকিগুলো পাওয়া চোরাবাজারে, নীলামে, কিউরিওর দোকানে। এই যে কাট-গ্লাসের সুরাপাত্রটি দেখছেন, এটা পাই কলকাতার রাসেল স্ট্রীটের একটা নীলামের দোকানে। এই পাত্রতে ব্র্যান্ডির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে একটি বিশালবপু সাহেবের মৃত্যু হয় কলকাতা শহরে।'

আমি কিছুক্ষণ থেকেই আলমারি জিনিসপত্র ছেড়ে ভদ্রলোকের নিজের চেহারার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলাম। অনেক লক্ষ করেও তাঁর মধ্যে ভণ্ডামির কোনো চিহ্ন ধরা পড়ল না। পাগলামির কোনো লক্ষণ রয়েছে কি! মনে তো হয় না। চোখে উদাস ভাবটা যেমন পাগলদের মধ্যে সম্ভব, তেমনি কবি, ভাবুক বা সাধকদের মধ্যেও সম্ভব।

আমি আর বেশিক্ষণ বসলাম না। বিদায় নিয়ে চৌকাঠ পেরোবার সময় ভদ্রলোক বললেন, 'আবার আসবেন। আপনাদের মতো লোকের জন্য আমার দরজা সব সময়েই খোলা। কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'অ্যালিস ভিলা হোটেল।'

'ও। তাহলে তো দশ মিনিটের হাঁটা পথ। বেশ লাগল আপনার সঙ্গ। কোনো কোনো লোককে আদৌ বরদাস্ত করতে পারিনি। আপনাকে সহৃদয় সমঝদার বলে মনে হয়।'

বিকেলে ডাঃ ভৌমিক চায়ে বলেছিলেন। আমি ছাড়া নিমন্ত্রিত আরো দুটি ভদ্রলোক। চায়ের সঙ্গে চানাচুর আর কেক খেতে খেতে বাতিকবাবুর প্রসঙ্গটা না তুলে পারলাম না। ভৌমিক বললেন, 'কতক্ষণ ছিলে?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'ওরে বাবা!' ডাঃ ভৌমিকের চোখ কপালে। 'এক ঘণ্টা ধরে ওই বুজরুকের কচকচি শুনলে?'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'যা প্যাচপেচে বৃষ্টি—স্বচ্ছন্দে বেড়ানোর তো উপায় নেই। হোটেলের ঘরে বন্দী হয়ে থাকার চেয়ে ওঁর গল্প শোনা বোধহয় ভালো।'

'কার কথা হচ্ছে?'

প্রশ্নটা এল একটি বছর চল্লিশেকের ভদ্রলোকের কাছ থেকে। মিস্টার খাস্তগির বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ডাঃ ভৌমিক। বাতিকবাবুর বাতিকের বর্ণনা শুনে খাস্তগির একটা বেঁকা হাসি হেসে বললেন, 'এসব লোককে এখানে আস্তানা গাড়তে দিয়ে দার্জিলিঙের বায়ু দূষিত করেছেন কেন ডাঃ ভৌমিক?'

ডাঃ ভৌমিক হালকা হেসে বললেন, 'এত বড় একটা শহরের বায়ু দূষিত করার ক্ষমতা কি লোকটার আছে? বোধহয় না।'

মিস্টার নস্কর নামক তৃতীয় ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষে বুজরুকদের কুপ্রভাব সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। শেষকালে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে বাতিকবাবু যেহেতু নেহাতই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন, তাঁর বুজরুকির প্রভাব আর পাঁচজনের উপর পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ভৌমিক দার্জিলিঙে রয়েছেন প্রায় ত্রিশ বছর। খাস্তগির অনেকদিনের বাসিন্দা। শেষ পর্যন্ত এদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। 'জলাপাহাড় রোডে কোনো অশ্বারোহী সাহেব হার্টফেল করে মারা যায়, এমন কোনো ঘটনা জানা আছে আপনাদের?'

'কে, মেজর ব্র্যাডলে?' প্রশ্ন করলেন ডাঃ ভৌমিক। 'সে তো বছর আষ্টেক আগেকার ঘটনা। স্ট্রোক হয়েছিল। সম্ভবত জলাপাহাড় রোডেই। হাসপাতালে এনেছিল, কিন্তু তার আগেই মারা যায়। কেন বল তো?'

আমি বাতিকবাবুর বোতামের কথাটা বললাম। মিস্টার খাস্তগির একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'লোকটা এইসব বলে অলৌকিক ক্ষমতা ক্লেম করছে নাকি? এ তো একের নম্বরের শয়তান দেখছি হে! সে নিজে দার্জিলিঙে রয়েছে অ্যাদ্দিন। ঘোড়ার পিঠে সাহেব মরেছে সে খবর তো এমনিতেই তার কানে পৌঁছুতে পারে। সেখানে অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজনটা আসছে কোত্থেকে?'

কথাটা অবিশ্যি আমারও মনে হয়েছিল। দার্জিলিঙে থেকে দার্জিলিঙেরই একটি ঘটনার কথা জানতে পারা বাতিকবাবুর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। আমি তাই আর প্রসঙ্গটা বাড়ালাম না।

চায়ের পর্ব এবং পাঁচরকম এলোমেলো কথাবার্তা শেষ হবার পর আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিস্টার নস্করও উঠে পড়লেন। বললেন উনিও অ্যালিস ভিলার দিকটাতেই থাকেন, তাই আমার সঙ্গে একসঙ্গেই হেঁটে ফিরবেন। আমরা ডাঃ ভৌমিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে সন্ধে হয়ে এসেছে। আমি দার্জিলিঙে আসার পর এই প্রথম দেখলাম আকাশের ঘন মেঘে ফাটল ধরেছে, আর সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি মঞ্চের স্পট লাইটের মতো শহর ও তার আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে পড়েছে।

মিস্টার নস্করকে দেখে বেশ মজবুত মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি চড়াই উঠতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। হাঁপানির মধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এই ভদ্রলোকটি কোথায় থাকেন?'

বললাম, 'দেখা করবেন নাকি?'

'না না। এমনি কৌতূহল হচ্ছিল।'

বাতিকবাবুর বাড়ির হদিস দিয়ে বললাম, 'ভদ্রলোক বেড়াতে-টেড়াতে বেরোন। হয়তো পথেই দেখা হয়ে যাতে পারে।'

কী আশ্চর্য, হলও তাই। কথাটা বলার দু মিনিটের মধ্যেই একটা মোড় ঘুরতেই সামনে বিশ হাত দূরে দেখি বাতিকবাবু ডান হাতে তাঁর লাঠি আর বাঁ হাতে একটা খবরের কাগজের মোড়ক নিয়ে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে সামনে দেখতে পেয়ে ভদ্রলোকের মুখের যে ভাবটা হল সেটাকে যদিও হাসি বলা চলে না, কিন্তু সেটা অপ্রসন্নভাব নয় নিশ্চয়ই। বললেন, 'বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ফেল হয়েছে ভাই, তাই মোমবাতি কিনে নিয়ে যাচ্ছি।'

ভদ্রতার খাতিরে মিস্টার নস্করের সঙ্গে আলাপটা না করিয়ে পারলাম না। 'মিস্টার নস্কর—মিস্টার মুখার্জি।'

নস্কর দেখলাম সাহেবী মেজাজের লোক। নমস্কার না করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বাতিকবাবু মুখে কোনোরকম সৌজন্য প্রকাশ না করে হাতটা ধরে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার তো বটেই, মিস্টার নস্করেরও নিশ্চয়ই বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল। প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থাকার পর আর না পেরে নস্কর বললেন, 'ওয়েল—আমি তাহলে এগোই। আপনার কথা শুনছিলাম, লাকিলি আলাপ হয়ে গেল।'

'চলি, মিস্টার মুখার্জি।' আমাকেও বাধ্য হয়েই কথাটা বলতে হল। বাতিকবাবুকে এবার সত্যিই পাগল বলে মনে হচ্ছিল। রাস্তার মাঝখানে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে কী যে ভাবছেন তা উনিই জানেন। আমাদের দুজনের বিদায় নেওয়াটা উনি যেন গ্রাহ্যই করলেন না। নস্করকে না হয় পছন্দ না হতে পারে, আমার সঙ্গে তো আজ সকালেই দিব্যি ভালো ব্যবহার করেছেন। ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ফিরে দেখলাম তিনি এখনো ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। নস্কর মন্তব্য করলেন, 'আপনার কাছে শুনে যতটা ছিটগ্রস্ত মনে হয়েছিল, এখন দেখছি তার চেয়েও বেশ কয়েক কাঠি বেশি।'

রাত ন'টা। সবেমাত্র ডিনার শেষ করে একটা পান মুখে দিয়ে গোয়েন্দা উপন্যাসটা নিয়ে বিছানায় ঢুকব ভাবছি, এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল একজন লোক নাকি আমার খোঁজ করছে। বাইরে বেরিয়ে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। এত রাত্রে বাতিকবাবু আমার কাছে কেন? আজই সন্ধেবেলা ভদ্রলোকের যে মুহ্যমান ভাবটা দেখেছিলাম, সেটা যেন এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি। বললেন, 'একটু বসবার জায়গা হবে ভাই—নিরিবিলি? বাইরে দাঁড়াতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে।'

ভদ্রলোককে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'পাল্সটা একবার দেখ তো। তোমায় তুমি বলছি কিছু মনে করো না।'

গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। রীতিমতো জ্বর। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একটা অ্যানাসিন দেব? আমার সঙ্গেই আছে।'

বাতিকবাবু হেসে বললেন, 'কোনো সিনেই কাজ দেবে না। জ্বর থাকবে এ রাতটা। কাল রেমিশন হয়ে যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা জ্বর নয়। তোমার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিনি। আমার যেটা দরকার সেটা ওই আংটিটা।'

আংটি? কোন্ আংটির কথা বলছেন ভদ্রলোক?

আমার হতভম্ব ভাব দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন, 'ওই যে লস্কর না তস্কর কী নাম বললে। তাঁর হাতের আংটিটা দেখনি? সস্তা আংটি—পাথর-টাথর নেই, কিন্তু ওটি আমার চাই।'

এখন মনে পড়ল মিস্টার নস্করের ডান হাতে একটা রূপোর সিগনেট রিং লক্ষ করেছিলাম বটে।

বাতিকবাবু বলে চলেছেন, 'হ্যান্ডশেকের সময় হাতের তেলোয় ঠেকে গেল আংটিটা। মনে হল শরীরের ভেতর একটা এক্সপ্লোশন হয়ে গেল। তারপর যা হয় তাই। রাস্তার মাঝখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখতে আরম্ভ করেছিলুম, এমন সময় উল্টোদিক থেকে একটা জীপ এসে দিলে সব মাটি

করে।'

'তার মানে ঘটনাটা আপনার দেখা হয়নি ?'

'যতদূর দেখেছি তাতেই যথেষ্ট। খুনের ব্যাপার। আততায়ীর মুখ দেখিনি। আংটিসমেত হাতটা এগিয়ে যাচ্ছে একটা লোকের গলার দিকে। ভিকটিম অবাঙালী। মাথায় রাজস্থানী টুপি, চোখে সোনার চশমা। চোখ বিস্ফারিত। চেঁচাবে বলে মুখ খুলেছে। তলার পাটির একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো...ব্যস্, এই পর্যন্ত। ও আংটি আমার চাই।'

আমি কয়েক মুহূর্ত বাতিকবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বাধ্য হয়েই বললাম, 'দেখুন মিস্টার মুখার্জি—আংটির যদি আপনার প্রয়োজন হয় তো আপনি নিজেই মিস্টার নস্করের কাছে চেয়ে দেখুন না। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ সামান্যই। আর যতদূর বুঝেছি, তিনি আপনার হবির ব্যাপারটা তেমন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না।'

'তাহলে আমি চেয়ে কী লাভ সেটা বল ? তার চেয়ে বরং—'

'ভেরি সরি মিস্টার মুখার্জি—' আমি ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে স্পষ্ট কথাটা না বলে পারলাম না—'আমি চাইলেও কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। এসব আংটি-টাংটির প্রতি একেক সময় মানুষের কী রকম মমতা থাকে সেটা তো আপনি জানেন। উনি যদি জিনিসটা ব্যবহার না করতেন তাহলে তবু...'

ভদ্রলোক আর বসলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যেই অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। আমি মনে মনে বললাম, ভদ্রলোকের আবদারটা একটু বেয়াড়া রকমের। রাস্তা থেকে জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু লোকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস নিয়ে তাঁর কালেকশন বাড়ানোর প্রয়াসটা অন্যায় প্রয়াস। এ ব্যাপারে কেউই তাঁকে সাহায্য করত না, আমিই বা করি কী করে ? আর নস্কর এমনিতেই বেশ কাঠখোট্টা লোক। তাঁর কাছে চেয়ে ওই আংটি পাবার আশা করাটাই ভুল।

পরদিন সকালে মেঘ কেটে গিয়ে দিন ফরসা হয়েছে দেখে চা খেয়ে বার্চ হিলের উদ্দেশে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। খট্‌খটে দিন। ম্যাল লোকে লোকারণ্য, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ও চেঞ্জারদের সঙ্গে কোলিশন বাঁচিয়ে ক্রমে গিয়ে পড়লাম অবজারভেটরি হিলের পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তাটায়। কাল রাত থেকেই মাঝে মাঝে বাতিকবাবুর করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, আর মনে মনে একটা ইচ্ছে দানা বাঁধছিল যদি ঘটনাচক্রে নস্করের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে একবার আংটির কথাটা বলে দেখব। হয়তো আংটিটার প্রতি তাঁর তেমন টান নেই, চাইলে দিয়ে দেবেন। সেটা বাতিকবাবুর হাতে তুলে দিতে পারলে তাঁর মুখের ভাব যে কেমন হবে সেটা বেশ

বুঝতে পারছিলাম। ছেলেবেলায় ডাক টিকিট জমাতাম, কাজেই হবির নেশা যে কী জিনিস সেটা আমার জানা ছিল। আর বাতিকবাবু লোকটা সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিজের উদ্ভট শখ নিয়েই মেতে আছেন। গায়ে পড়ে কাউকে দলে টানবার চেষ্টা করছেন না, হয়তো জীবনে এই প্রথম অন্যের একটা জিনিসের প্রতি লোভ দেখাচ্ছেন—তাও সেটা এমন মহামূল্য কিছুই নয়। সত্যি বলতে কি, কাল রাত্রের পরে আমার ধারণা হয়েছে যে ভদ্রলোকের অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা কিছুই নেই, ওঁর শখের সমস্ত ব্যাপারটাই ওঁর আধপাগলা মনের কল্পনার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতেই যদি এই নিঃসঙ্গ লোকটি খুশি থাকে, তাতে আর কী এসে যাচ্ছে ? কিন্তু বার্চ হিলের রাস্তায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুরেও নস্করের সঙ্গে দেখা হল না। ম্যালে যখন এসে পৌঁছেছি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ভিড় তখনো রয়েছে, কিন্তু যাবার সময় যেমন দেখে গেছি, তার চেয়ে যেন একটু তফাত। এদিকে ওদিকে ইতস্তত ছড়ানো দশ-বিশ জনের জটলা, এবং সেই জটলার মধ্যে কী নিয়ে যেন উত্তেজিত আলোচনা চলেছে। এগিয়ে যেতে 'পুলিশ' 'তদন্ত' 'খুন' ইত্যাদি কথাগুলো কানে আসতে লাগল। একটি অপরিচিত প্রৌঢ় বাঙালীকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার মশাই ? কিছু হয়েছে-টয়েছে নাকি ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কলকাতা থেকে কে এক সাস্‌পেক্টেড ক্রিমিন্যাল নাকি এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছিল। তাকে ধাওয়া করে পুলিশ এসেছে, খানাতল্লাসী চলেছে !'

'লোকটার নাম জানেন ?'

'আসল নাম জানি না। এখানে নাকি নস্কর বলে পরিচয় দিয়েছে।'

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। একটিমাত্র লোকই আসল খবরটা দিতে পারবেন—ডাঃ ভৌমিক।

তাঁর বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হল না। লেডেন-লা রোডে রিকশার স্ট্যান্ডের কাছে খাস্তগির ও ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললেন, 'ভাবতে পার ! লোকটা কাল বিকেলে আমার বাড়িতে বসে চা খেয়ে গেল। পেটে একটা পেন হচ্ছে বলে তিন দিন আগে আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসার জন্য, আমি ওষুধ দিয়েছি। একা লোক, নতুন এসেছে, তাই তাকে বাড়িতে খেতে ডাকলাম, আর আজ এই ব্যাপার !'

'লোকটা ধরা পড়েছে ?' উদ্‌গ্রীবভাবে প্রশ্ন করলাম।

'এখনো পড়েনি। সকাল থেকে মিসিং। পুলিশ খুঁজে চলেছে। তবে এই শহরেই তো আছে, যাবে আর কোথায়। কিন্তু কী সাংঘাতিক ব্যাপার বল তো !...'

ভৌমিক আর খাস্তগির চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার নাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শুধু নস্কর ক্রিমিন্যাল বলে নয়, বাতিকবাবুর আংটির প্রতি লোভের কথা ভেবে। খুনীর হাতের আংটি—ভদ্রলোক বলেছিলেন। তাহলে কি সত্যিই লোকটার মধ্যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে ?

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ইচ্ছে করল বাতিকবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি। ভদ্রলোক কি খবরটা পেয়েছেন ? একবার খোঁজ করে দেখা দরকার।

কিন্তু সতের নম্বর বাড়ির দরজায় বার তিনেক টোকা দিয়েও কোনো উত্তর পেলাম না। এদিকে আবার মেঘ করে এসেছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে আমার হোটেলে চলে এলাম। আধঘন্টার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝলমলে সকালটা এক নিমেষে একটা সুদূর অতীতের ঘটনায় পরিণত হল। পুলিশ সার্চ চালিয়ে চলেছে। কোথায় গা ঢাকা দিলেন মিস্টার নস্কর ? কাকে খুন করলেন ভদ্রলোক ? কীভাবে খুন ?

সাড়ে তিনটার সময় আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মিঃ সোন্ধি খবরটা আনলেন। নস্কর যে বাড়িটায় ছিল, তার ঠিক পিছনেই পাহাড়ের খাদে ত্রিশ হাত নীচে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় নস্করের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আত্মহত্যা, মস্তিষ্কবিকৃতি, পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা রকম কারণ অনুমান করা হচ্ছে। ব্যবসাগত ব্যাপারে পার্টনারের সঙ্গে শত্রুতা। সেই থেকে খুন, মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে দার্জিলিঙে এসে গা ঢাকা, পুলিশ কর্তৃক কলকাতায় মৃতদেহ আবিষ্কার, ইত্যাদি।

নাঃ—বাতিকবাবুর সঙ্গে একবার দেখা না করলেই নয়। লোকটাকে আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সুইটজারল্যান্ড ওয়ালটেয়ারের ঘটনা মনগড়া হতে পারে, দার্জিলিঙের ঘটনা তিনি আগে থেকে জেনে থাকতে পারেন, কিন্তু নস্কর যে খুনী সেটা তিনি জানলেন কী করে ?

পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরতেই তাঁর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। বাতিকবাবু হেসে বললেন, 'এসো ভায়া, ভেতরে এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

ভেতরে ঢুকলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতিকবাবুর টেবিলের উপর টিমটিম করে একটা মোমবাতি জ্বলছে ! 'আজও ইলেকট্রিসিটি আসেনি,' ম্লান হাসি হেসে বললেন ভদ্রলোক। আমি বেতের চেয়ারে বসে বললাম, 'খবর পেয়েছেন ?'

'তোমার সেই তস্করের খবর ? খবরে আর আমার কী হবে বল, আমি সবই জানতে পেরেছিলাম। তবে, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞ ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি সে আমাকে দিয়ে গেছে।'

'দিয়ে গেছে ?' আমার গলা শুকনো।

'ওই দেখ না টেবিলের উপর।'

আবার টেবিলের দিকে চাইতে মোমবাতির পাশেই খোলা খাতার সাদা পাতার উপর আংটিটা চোখে পড়ল।

'ঘটনার বর্ণনাটা লিখে রাখছি। আইটেম নম্বর ওয়ান সেভেন থ্রী,' বাতিকবাবু বললেন। আমার মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরছে। 'দিয়ে গেছে মানে ? কখন দিয়ে গেল ?'

'এমনিতে কি দিতে চায় ? বাতিকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'জোর করে নিতে হল।'

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। ঘরের ভিতর একটা টাইমপিস টিক্‌টিক্ করে বেজে চলেছে।

'তুমি এসে ভালোই হল,' বাতিকবাবু বললেন, 'একটা জিনিস তোমাকে দিচ্ছি, সেটা তোমার কাছেই রেখে দিও।'

বাতিকবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের উল্টোদিকে অন্ধকার কোণটায় চলে গেলেন। সেখান থেকে খুটখুট শব্দ এলো, আর তার সঙ্গে তাঁর কথা—

'এটাও আমার সংগ্রহে রাখার উপযুক্ত, কিন্তু এটার প্রভাব আমি সহ্য করতে পারছি না। বার বার জ্বর আসছে, আর একটা ভারী অপ্রীতিকর দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।'

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে রয়েছেন তিনি। সেই হাতে ধরা রয়েছে তাঁর অতি পরিচিত লাঠিটা।

মোমবাতির এই ম্লান আলোতেও বুঝতে পারলাম যে লাঠির হাতলের মাথায় যে লাল দাগটা রয়েছে, সেটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ ছাড়া আর কিছুই না।

বারীন ভৌমিকের ব্যারাম

কনডাক্টরের নির্দেশমতো 'ডি' কামরায় ঢুকে বারীন ভৌমিক তাঁর সুটকেসটা সিটের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। ওটা পথে খোলার দরকার হবে না। ছোট ব্যাগটা হাতের কাছে রাখা দরকার। চিরুনি, বুরুশ, টুথ-ব্রাশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ট্রেনে পড়ার জন্য হ্যাড্‌লি চেজের বই—সবই রয়েছে ঐ ব্যাগে। আর আছে থ্রোট পিল্‌স। ঠাণ্ডা ঘরে ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে কাল গান খুলবে না। চট করে একটা বড়ি মুখে পুরে দিয়ে বারীন ভৌমিক ব্যাগটাকে জানালার সামনে টেবিলটার উপর রেখে দিলেন।

দিল্লীগামী ভেস্টিবিউল ট্রেন, ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি, অথচ তাঁর কামরায় আর প্যাসেঞ্জার নেই কেন? এতখানি পথ কি তিনি একা যাবেন? এতটা সৌভাগ্য কি তাঁর হবে? এ যে একেবারে আয়েশের পরাকাষ্ঠা! অবস্থাটা কল্পনা করে বারীন ভৌমিকের গলা থেকে আপনিই একটা গানের কলি বেরিয়ে পড়ল—বাগিচায় বুলবুল তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল!

বারীন ভৌমিক জানালা দিয়ে বাইরে হাওড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মের জনস্রোতের দিকে চাইলেন। দুটি ছোক্‌রা তাঁর দিকে চেয়ে পরস্পরে কী যেন বলাবলি করছে। বারীনকে চিনেছে তারা। অনেকেই চেনে। অন্তত কলকাতা শহরের, এবং অনেক বড় বড় মফস্বল শহরের অনেকেই শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর নয়, তাঁর চেহারার সঙ্গেও পরিচিত। প্রতি মাসেই পাঁচ-সাতটা ফাংশনে তাঁর ডাক পড়ে। বারীন ভৌমিক—গাইবেন নজরুলগীতি ও আধুনিক। খ্যাতি ও অর্থ—দুই-ই এখন বারীন ভৌমিকের হাতের মুঠোয়। অবিশ্যি এটা হয়েছে বছর পাঁচেক হল। তার আগে কয়েকটা বছর তাঁকে বেশ, যাকে বলে, স্ট্রাগলই করতে হয়েছে। গানের জন্য নয়। গাইবার ক্ষমতাটা তাঁর সহজাত। কিন্তু শুধু গাইলেই তো আর হয় না। তার সঙ্গে চাই কপালজোর, আর চাই ব্যাকিং।

উনিশ শো সাতষট্টি সালে উনিশ পল্লীর পুজো প্যান্ডেলে ভোলাদা—ভোলা বাঁড়ুজ্যে—তাঁকে দিয়ে যদি না জোর করে 'বসিয়া বিজনে' গানখানা গাওয়াতেন...

বারীন ভৌমিকের দিল্লী যাওয়াটাও এই গানেরই দৌলতে। দিল্লীর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ফার্স্ট ক্লাসের খরচ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জুবিলী অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। থাকার ব্যবস্থাও অ্যাসোসিয়েশনই করবে। দুদিন দিল্লীতে থেকে তারপর আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি দেখে ঠিক সাতদিন পরে আবার কলকাতায় ফিরবেন বারীন ভৌমিক। তারপর পুজো পড়ে গেলে তাঁর আর অবসর নেই ; প্রহরে প্রহরে হাজিরা দিতে হবে গানের আসরে, শ্রোতাদের কানে মধুবর্ষণ করার জন্য।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা স্যার...'

কন্ডাক্টর গার্ড এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কী পাওয়া যায় ?' বারীন প্রশ্ন করলেন।

'আপনি নন-ভেজিটেরিয়ান তো ? দিশি খাবেন না ওয়েস্টার্ন স্টাইল ? দিশি হলে আপনার...'

বারীন নিজের পছন্দমতো লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে সবেমাত্র একটি থ্রী কাস্‌লস ধরিয়েছেন, এমন সময় আরেকটি প্যাসেঞ্জার এসে কামরায় ঢুকলেন, এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর গাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে তার যাত্রা শুরু করল।

নবাগত যাত্রীটির সঙ্গে চোখাচুখি হতেই তাঁকে চেনা মনে হওয়ায় বারীনের মুখে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়ে আগন্তুকের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। বারীন কি তাহলে ভুল করলেন ? ছি ছি ছি ! এই অবিবেচক বোকা হাসিটার কী দরকার ছিল। কী অপ্রস্তুত ! মনে পড়ল একবার রেসের মাঠে একটি ব্রাউন পাঞ্জাবীপরা প্রৌঢ় ভদ্রলোককে পিছন দিক থেকে 'কী খবরো-র ত্রিদিবদা' বলে পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারার পরমুহূর্তেই বারীন বুঝেছিলেন তিনি আসলে ত্রিদিবদা নন। এই লজ্জাকর ঘটনার স্মৃতি তাঁকে অনেক দিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছিল। মানুষকে অপদস্থ করার জন্য কত রকম ফাঁদ যে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে !

বারীন ভৌমিক আরেকবার আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ভদ্রলোক স্যান্ডাল খুলে সিটের উপর পা ছড়িয়ে বসে সদ্য কেনা ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লিটা নেড়ে-চেড়ে দেখছেন। কী আশ্চর্য ! আবার মনে হচ্ছে তিনি লোকটিকে আগে দেখেছেন। নিমেষের দেখা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণের দেখা। কিন্তু কবে ? কোথায় ? ঘন ভুরু, সরু গোঁফ, পমেড দিয়ে পালিশ করা চুল, কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট আঁচিল। এ মুখ তাঁর চেনা। নিশ্চয়ই চেনা। তিনি যখন সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফে চাকরি করতেন তখনকার চেনা কি ? কিন্তু একতরফা

চেনা হয় কী করে ? ওঁর হাবভাব দেখে তো মনে হয় না যে তিনি কস্মিনকালেও বারীন ভৌমিককে দেখেছেন।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা...'

আবার কন্ডাক্টর গার্ড। বেশ হাসিখুশি হৃষ্টপুষ্ট অমায়িক ভদ্রলোকটি।

'শুনুন,' আগন্তুক বললেন, 'লাঞ্চ তো হল—আগে এক কাপ চা হবে কি ?'

'সার্টেনলি।'

'শুধু একটা কাপ আর লিকার দিলেই হবে। আমি র' টী খাই।'

বারীন ভৌমিকের হঠাৎ মনে হল তাঁর তলপেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়ে জায়গাটা একদম খালি হয়ে গেছে। আর তার পরেই মনে হল তাঁর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ হাত-পা গজিয়ে ফুসফুসের খাঁচাটার মধ্যে লাফাতে শুরু করেছে। শুধু গলার স্বর নয়, ওই গলার স্বরে বিশেষভাবে বিশেষ জোর দিয়ে বলা শুধু একটি কথা—র' টী—ব্যাস্। ওই একটি কথা বারীনের মনের সমস্ত অনিশ্চয়তাকে এক ধাক্কায় দূর করে দিয়ে সেই জায়গায় একটি স্থির প্রত্যয়কে এনে বসিয়ে দিয়েছে।

বারীন যে এই ব্যক্তিটিকে শুধু দেখেছেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে ঠিক এই একইভাবে দিল্লীগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় মুখোমুখি বসে একটানা প্রায় আট ঘণ্টা ভ্রমণ করেছেন। তিনি নিজে যাচ্ছিলেন পাটনা, তাঁর আপন মামাতো বোন শিপ্রার বিয়েতে। তার তিন দিন আগে রেসের মাঠে ট্রেব্‌ল টোটে একসঙ্গে সাড়ে সাত হাজার টাকা জিতে তিনি জীবনে প্রথমবার প্রথম শ্রেণীতে ট্রেনে চড়ার লোভ সামলাতে পারেননি। তখনও তাঁর গাইয়ে হিসেবে নাম হয়নি ; ঘটনাটা ঘটে সিক্সটি-ফোরে। —ন'বছর আগে। ভদ্রলোকের পদবীটাও যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে। 'চ' দিয়ে। চৌধুরী ? চক্রবর্তী ? চ্যাটার্জি ?...

কন্ডাক্টর গার্ড লাঞ্চের অর্ডার নিয়ে চলে গেলেন। বারীন অনুভব করলেন তিনি আর এই লোকটার মুখোমুখি বসে থাকতে পারছেন না। বাইরে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালেন, দরজার মুখ থেকে পাঁচ হাত ডাইনে, 'চ'-এর দৃষ্টির বেশ কিছুটা বাইরে। কোইন্সিডেন্সের বাংলা বারীন ভৌমিক জানেন না, কিন্তু এটা জানেন যে, প্রত্যেকের জীবনেই ও জিনিসটা বার কয়েক ঘটে থাকে। কিন্তু তা বলে এই রকম কোইন্সিডেন্স ?

কিন্তু 'চ' কি তাঁকে চিনেছেন ? না-চেনার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, হয়তো 'চ'-এর স্মরণশক্তি কম ; দুই, হয়তো এই ন'বছরে বারীনের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে দেখতে দেখতে বারীন ভাবতে চেষ্টা করলেন, তাঁর ন'বছর আগের চেহারার সঙ্গে

আজকের চেহারার কী তফাত থাকতে পারে।

ওজন বেড়েছে অনেক, সুতরাং অনুমান করা যায় তাঁর মুখটা আরো ভরেছে। আর কী ? চশমা ছিল না, চশমা হয়েছে। গোঁফ ? কবে থেকে গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন তিনি ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খুব বেশিদিন নয়। হাজরা রোডের সেই সেলুন। একটা নতুন ছোক্‌রা নাপিত। দুপাশের গোঁফ মিলিয়ে কাটতে পারল না। বারীন নিজে ততটা খেয়াল করেননি, কিন্তু আপিসের সেই গোপ্‌পে লিফ্‌টম্যান শুকদেও থেকে শুরু করে বাষট্টি বছরের বুড়ো ক্যাশিয়ার কেশববাবু পর্যন্ত যখন সেই নিয়ে মন্তব্য করলেন তখন বারীন মরিয়া হয়ে তাঁর সাধের গোঁফটি কামিয়ে ফেলেন। সেই থেকে আর রাখেননি। এটা চার বছর আগের ঘটনা।

গোঁফ বাদ, গালে মাংসযোগ, চোখে চশমাযোগ। বারীন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কামরায় এসে ঢুকলেন।

বেয়ারা একটা ট্রেতে চায়ের কাপ আর টি-পট 'চ'-এর সামনে পেতে দিয়ে চলে গেল। বারীনও পানীয়ের প্রয়োজনবোধ করছিলেন—ঠাণ্ডা হোক, গরম হোক—কিন্তু বলতে গিয়েও বললেন না।

যদি গলার স্বরে চিনে ফেলে !

আর চিনলে পরে যে কী হতে পারে সেটা বারীন কল্পনাও করতে চান না। অবিশ্যি সবই নির্ভর করে 'চ' কি রকম লোক তার উপর। যদি অনিমেষদার মতো হন, তাহলে বারীন নিস্তার পেলেও পেতে পারেন। একবার বাসে একটা লোক অনিমেষদার পকেট হাতড়াচ্ছিল। টের পেয়েও লজ্জায় তিনি কিছু বলতে পারেননি। মানিব্যাগ সমেত চারটি দশ টাকার করকরে নোট তিনি পকেটমারটিকে প্রায় একরকম দিয়েই দিয়েছিলেন। পরে বাড়িতে এসে বলেছিলেন, 'পাবলিক বাসে একগাড়ি লোকের ভেতর একটা সীন হবে, আর তার মধ্যে একটা প্রমিনেন্ট পার্ট নেব আমি—এ হতে দেওয়া যায় না।' এই লোক কি সেই রকম ? না হওয়াটাই স্বাভাবিক ; কারণ অনিমেষদার মতো লোক বেশি হয় না। তাছাড়া চেহারা দেখেও মনে হয় এ-লোক সে-রকম নয়। ওই ঘন ভুরু, ঠোক্কর খাওয়া নাক, সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা থুতনি—সব মিলিয়ে মনে হয়, এ-লোক বারীনকে চিনতে পারলেই তার লোমশ হাত দিয়ে শার্টের কলারটা খামচে ধরে বলবে, 'আপনিই সেই লোক না ?—যিনি সিক্সটি-ফোরে আমার ঘড়ি চুরি করেছিলেন ? স্কাউন্ড্রেল ! এই ন'বছর ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। আজ আমি তোমার...'

আর ভাবতে পারলেন না বারীন ভৌমিক। এই ঠাণ্ডা কামরাতেও তাঁর কপাল ঘেমে উঠেছে। রেলওয়ের রেক্সিনে মোড়া বালিশে মাথা দিয়ে তিনি

সটান সিটের উপর শুয়ে পড়ে বাঁ হাতটা দিয়ে চোখটা ঢেকে নিলেন। চোখ দেখেই সবচেয়ে সহজে মানুষকে চিনতে পারা যায়। বারীনও প্রথমে চোখ দেখেই 'চ'কে চিনতে পেরেছিলেন।

প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর মনে পড়ছে। শুধু 'চ'-এর ঘড়ি চুরির ঘটনা না। সেই ছেলে-বয়েসে যার যা কিছু চুরি করেছেন সব তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। একেক সময় খুবই সামান্য সে জিনিস। হয়তো একটা সাধারণ ডট পেন (মুকুলমামার), কিংবা একটা সস্তা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস (তাঁর স্কুলের সহপাঠী অক্ষয়ের), অথবা ছেনিদার একজোড়া হাড়ের কাফলিংক্‌স, যেটার কোনোও প্রয়োজন ছিল না বারীনের, কোনোদিন ব্যবহারও করেননি। চুরির কারণ এই যে, সেগুলো হাতের কাছে ছিল, এবং সেগুলো অন্যের জিনিস। বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর পর্যন্ত কমপক্ষে পঞ্চাশটা পরের জিনিস বারীন ভৌমিক কোনো না কোনো উপায়ে আত্মসাৎ করে নিজের ঘরে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। একে চুরি ছাড়া আর কী বলা যায় ? চোরের সঙ্গে তফাত শুধু এই যে, চোর চুরি করে অভাবের তাড়নায়, আর তিনি করেছেন অভ্যাসের বশে। লোকে তাঁকে কোনোদিন সন্দেহ করেনি, তাই কোনোদিন ধরা পড়তে হয়নি। বারীন জানেন যে এইভাবে চুরি করাটা একটা ব্যারাম বিশেষ। একবার কথাচ্ছলে এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে তিনি ব্যারামের নামটাও জেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না।

তবে ন'বছর আগে 'চ'-এর ঘড়ি নেওয়ার পর থেকে আজ অবধি এ কাজটা বারীন আর কক্ষনো করেননি। এমন কি করার সেই সাময়িক অথচ প্রবল আকাঙ্ক্ষাটাও অনুভব করেননি। বারীন জানেন যে এই উৎকট রোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

তাঁর অন্যান্য চুরির সঙ্গে ঘড়ি চুরির একটা তফাত ছিল এই যে, ঘড়িটায় তাঁর সত্যিই প্রয়োজন ছিল। রিস্টওয়াচ না ; সুইজারল্যান্ডে তৈরি একটি ভারী সুন্দর ট্র্যাভলিং ক্লক। একটা নীল চতুষ্কোণ বাক্স, তার ঢাকনাটা খুললেই ঘড়িটা বেরিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যালার্ম ঘড়ি, আর সেই অ্যালার্মের শব্দ এতই সুন্দর যে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কান জুড়িয়ে যায়। এই ন'বছর সমানে সেটা ব্যবহার করেছেন বারীন ভৌমিক। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই সঙ্গে গেছে ঘড়ি।

আজকেও সে ঘড়ি তাঁর সঙ্গেই আছে। জানালার সামনে ওই টেবিলের উপর রাখা ব্যাগের মধ্যে।

'কদ্দূর যাবেন ?'

বারীন তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন। লোকটা তাঁর সঙ্গে কথা বলছে,

তাঁকে প্রশ্ন করছে।

'দিল্লী।'

'আজ্ঞে?'

'দিল্লী।'

প্রথমবার অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে একটু বেশি আস্তে উত্তর দিয়ে ফেলেছিলেন বারীন।

'আপনার কি ঠাণ্ডায় গলা বসে গেল নাকি।'

'নাঃ।'

'ওটা হয় মাঝে মাঝে। অ্যাকুয়েলি এয়ার কন্ডিশনিং-এর একমাত্র লাভ হচ্ছে ধুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। নাহলে আমি এমনি ফার্স্ট ক্লাসেই যেতুম।'

বারীন চুপ। পারলে তিনি 'চ'-এর দিকে তাকান না, কিন্তু 'চ' তাঁর দিকে দেখছে কিনা সেটা জানার দুর্নিবার কৌতূহলই তাঁর দৃষ্টি বার বার ভদ্রলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'চ' নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। অভিনয় কী? সেটা বারীন জানেন না। সেটা জানতে হলে লোকটিকে আরো ভালো করে জানা দরকার। বারীন যেটুকু জানেন সেটা তাঁর গতবারের জানা। এক হল দুধ-চিনি ছাড়া চা-পানের অভ্যাস। আরেক হল স্টেশন এলেই নেমে গিয়ে কিছু না কিছু খাবার জিনিস কিনে আনা। নোন্‌তা জিনিস, মিষ্টি নয়। মনে আছে গতবার বারীন ভৌমিকের অনেক রকম মুখরোচক জিনিস খাওয়া হয়ে গিয়েছিল 'চ'-এর দৌলতে।

এছাড়া তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক প্রকাশ পেয়েছিল পাটনা স্টেশনের কাছাকাছি এসে। এটার সঙ্গে ঘড়ির ব্যাপারটা জড়িত। তাই ঘটনাটা বারীনের স্পষ্ট মনে আছে। সেবার গাড়িটা ছিল অমৃতসর মেল। পাটনা পৌঁছবে ভোর পাঁচটায়। কন্ডাক্টর এসে সাড়ে চারটেয় তুলে দিয়েছেন বারীনকে। 'চ'ও আধ-জাগা, যদিও তিনি যাচ্ছেন দিল্লী। গাড়ি স্টেশনে পৌঁছাবার ঠিক তিন মিনিট আগ হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ব্যাপার কী? লাইনের উপর দিয়ে ল্যাম্প ও টর্চের ছুটোছুটি দেখে মনে হল কোনো গোলমাল বেধেছে। শেষটায় গার্ড এসে বললেন একটা বুড়ো নাকি লাইন পার হতে গিয়ে এঞ্জিনে কাটা পড়েছে। তার লাশ সরালেই গাড়ি চলবে। 'চ' খবরটা পাওয়ামাত্র ভারি উত্তেজিত হয়ে স্লিপিং সুট পরেই অন্ধকারে নেমে চলে গেলেন ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে আসতে।

এই সুযোগেই বারীন তাঁর বাক্স থেকে ঘড়িটি বার করে নেন। সেই রাত্রেই 'চ'কে দেখেছিলেন সেটায় দম দিতে। লোভও যে লাগেনি তা নয়, তবে

সুযোগের অভাব হবে জেনে ঘড়ির চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুযোগ এসে পড়াতে সে-লোভ এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে, বাঙ্কের উপর অন্য একটি ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি। কাজটা করতে তাঁর লাগে মাত্র পনের-বিশ সেকেন্ড। 'চ' ফিরলেন প্রায় পাঁচ মিনিট পরে।

'হরিব্‌ল ব্যাপার! ভিখিরি। ধড় একদিকে, মুড়ো একদিকে। সামনে কাউক্যাচার থাকতে কাটা যে কেন পড়ে বুঝতে পারি না মশাই। ওটার উদ্দেশ্য তো লাইনে কিছু পড়লে সেটাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেওয়া!...'

পাটনায় নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মেজোমামার মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বারীন ভৌমিকের তলপেটের অসোয়াস্তিটা ম্যাজিকের মতো উবে যায়। তাঁর মন বলে, ঘড়ির মালিকের সঙ্গে এতকাল যে ব্যবধান ছিল—কেউ কারুর নাম শোনেনি, কেউ কাউকে দেখেনি—গত আট ঘণ্টার আকস্মিক সান্নিধ্যের পর আবার সেই ব্যবধান এসে পড়েছে। এর পরে আবার কোনো দিন পরস্পরের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে এক। কিংবা হয়তো তার চেয়েও কম।

কিন্তু এই তিলপ্রমাণ সম্ভাবনাই যে ন'বছর পরে হঠাৎ সত্যে পরিণত হবে সেটা কে জানত? বারীন মনে মনে বললেন, এই ধরনের ঘটনা থেকেই মানুষ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে।

'আপনি কি দিল্লীর বাসিন্দা, না কলকাতার?'

বারীনের মনে পড়ল সেবারও লোকটা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করেছিল। এই গায়ে পড়া আলাপ করার বাতিকটা বারীন পছন্দ করেন না।

'কলকাতা,' বারীন জবাব দিলেন। তাঁর অজান্তেই তাঁর স্বাভাবিক গলার স্বরটা বেরিয়ে পড়েছে। বারীন নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ভবিষ্যতে তাঁকে আরো সতর্ক হতে হবে।

কিন্তু এ কী! ভদ্রলোক তাঁর দিকে এভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন কেন? সহসা এ হেন কৌতূহলের কারণ কী? বারীন অনুভব করলেন তাঁর নাড়ি আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'আপনার কি রিসেন্টলি কোনো ছবি বেরিয়েছে কাগজে?'

বারীন বুঝলেন এ ব্যাপারে সত্য গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ট্রেনে অন্যান্য বাঙালী যাত্রী রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁকে চিনে ফেললেও ফেলতে পারে। এর কাছে নিজের পরিচয়টা দিলে ক্ষতি কী? বরং বারীন যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি সেটা জানলে পরে ন'বছর আগের সেই ঘড়ি-চোরের সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখা 'চ'-এর পক্ষে আরো অসম্ভব হবে।

'কোথায় দেখেছেন আপনি ছবি?' বারীন পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি গান করেন কি ?' আবার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, তা একটু-আধটু...'

'আপনার নামটা... ?'

'বারীন্দ্রনাথ ভৌমিক।'

'তাই বলুন। বারীন ভৌমিক। তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি তো রেডিওতেও গেয়ে থাকেন মাঝে মাঝে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার স্ত্রী আপনার খুব ভক্ত। দিল্লী যাচ্ছেন কি গানের ব্যাপারে ?'

'হ্যাঁ।'

বেশি ভেঙে বলবেন না বারীন। শুধু হ্যাঁ বা না-য়ে যদি উত্তর হয়, তবে তাই বলবেন।

'দিল্লীতে এক ভৌমিক আছে—ফিনান্সে। স্কটিশে পড়ত আমার সঙ্গে। নীতীশ ভৌমিক। আপনার কোনো ইয়ে-টিয়ে নাকি ?'

ইয়ে-টিয়েই বটে। বারীনের খুড়তুতো দাদা। কড়া সাহেবী মেজাজের লোক, তাই বারীনের আত্মীয় হলেও সমগোত্রীয় নয়।

'আজ্ঞে না। আমি চিনি না।'

এখানে মিথ্যে বলাটাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন বারীন। লোকটা এবার কথা বন্ধ করলে পারে। এত জেরা কেন রে বাপু।

যাক্, লাঞ্চ এসে গেছে। আশা করি কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নবাণ বন্ধ হবে।

হলও তাই। 'চ' ভোজনরসিক। একবার মুখে খাদ্য প্রবেশ করলে কথার রাস্তা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বারীন ভৌমিকের ভয় খানিকটা কেটে গেলেও একটা অসোয়াস্তি এখনো রয়ে গেছে। এখনো বিশ ঘণ্টার পথ বাকি। মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার বড় আশ্চর্য জিনিস। কিসে খোঁচা মেরে কোন্ আদ্যিকালের কোন্ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবে তার কিচ্ছু ঠিক নেই। ওই যেমন র' টী। বারীনের বিশ্বাস ওই বিশেষ কথাটা না শুনলে যে সেই ন'বছর আগের ঘড়ির মালিক 'চ' সে ধারণা কিছুতেই ওর মনে বদ্ধমূল হত না। সে-রকম বারীনেরও কোনো কথায় বা কাজে যদি তাঁর পুরনো পরিচয়টা 'চ'-এর কাছে ধরা পড়ে যায় ?

এইসব ভেবে বারীন স্থির করলেন যে তিনি কথাও বলবেন না, কাজও করবেন না। খাবার পর মুখের সামনে হ্যাড্‌লি চেজের বইটা খুলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদটা শেষ করে সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যে 'চ' ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। ইলাস্‌ট্রেটেড

উইক্‌লিটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে, চোখ দুটো হাতে ঢাকা, কিন্তু বুকের ওঠা-নামা দেখে ঘুমন্ত লোকের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস বলেই মনে হয়। বারীন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। মাঠ-ঘাট, গাছপালা, খোলার বাড়ি মিলিয়ে বেহারের রুক্ষ দৃশ্য। জানালার ডবল কাঁচ ভেদ করে ট্রেনের শব্দ প্রায় পাওয়াই যায় না। যেন দূর থেকে শোনা অনেক মৃদঙ্গে একইসঙ্গে একই বোল তোলার শব্দ—ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্...

এই শব্দের সঙ্গে এবার যোগ হল আরেকটি শব্দ, 'চ'-এর নাসিকাধ্বনি।

বারীন ভৌমিক অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। নজরুলের একটা বাছাই করা গানের প্রথম লাইনটা গুনগুন করে দেখলেন। সকালের মতো অতটা মসৃণ না হলেও, গলাটা তাঁর নিজের কানে খারাপ লাগল না। এবার বেশি শব্দ না করে গলাটা খাঁক্‌রে তিনি গানটা আবার ধরলেন। এবং ধরেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে থেমে যেতে হল।

একটা চরম বিভীষিকাজনক শব্দ তাঁর গলা শুকিয়ে দিয়ে গান বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার শব্দ।

তাঁর ব্যাগের মধ্যে রাখা সুইস ঘড়িতে কেমন করে জানি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। এবং বেজেই চলেছে। বারীন ভৌমিকের হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে। তাঁর দেহ কাষ্ঠবৎ। তাঁর দৃষ্টি ঘুমন্ত 'চ'-এর দিকে নিবদ্ধ।

'চ'-এর হাত যেন একটু নড়ল। বারীন প্রমাদ গুনলেন।

'চ'-এর ঘুম ভেঙেছে। চোখের উপর থেকে হাত সরে এল।

'গেলাসটা বুঝি ? ওটাকে নামিয়ে রাখুন তো—ভাইব্রেট করছে।'

বারীন ভৌমিক দেয়ালে লাগানো লোহার আংটার ভেতর থেকে গেলাসটা তুললেই শব্দটা থেমে গেল। সেটা টেবিলে রাখার আগে তার ভিতরের জলটুকু খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে তিনি খানিকটা আরাম পেলেন। তবু গানের অবস্থায় আসতে দেরি আছে।

হাজারিবাগ রোডের কিছু আগে চা এল। পর পর দু পেয়ালা গরম চা খেয়ে এবং 'চ'-এর কাছ থেকে আর কোনোরকম জেরা বা সন্দেহের কোনো লক্ষণ না পেয়ে বারীনের গলা আরো অনেকটা খোলসা হল। বাইরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ আর দূরের টিলার দিকে চেয়ে গাড়ির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে একটা আধুনিক গানের খানিকটা গুনগুন করে গেয়ে আসন্ন বিপদের শেষ আশঙ্কাটুকু তাঁর মন থেকে কেটে গেল।

গয়াতে 'চ' তাঁর ন'বছরের আগের অভ্যাস অনুযায়ী প্ল্যাটফর্মে নেমে সেলোফোনে মোড়া দু প্যাকেট চানাচুর কিনে এনে তার একটা বারীন ভৌমিককে

দিলেন। বারীন দিব্যি তৃপ্তির সঙ্গে সেটা খেলেন। গাড়ি ছাড়ার মুখে সূর্য ডুবে গেল। ঘরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে 'চ' বললেন—

'আমরা কি লেট রান করছি ? আপনার ঘড়িতে কটা বাজে ?'

এই প্রথম বারীন ভৌমিকের খেয়াল হল যে 'চ'-এর হাতে ঘড়ি নেই। ব্যাপারটা অনুধাবন করে তিনি বিস্মিত হলেন এবং হয়তো সে বিস্ময়ের খানিকটা তাঁর চাহনিতে প্রকাশ পেল। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল 'চ'-এর প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি। নিজের ঘড়ির দিকে একঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'সাতটা পঁয়ত্রিশ।'

'তাহলে তো মোটামুটি টাইমেই যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ।'

'আমার ঘড়িটা আজই সকালে...এইচ এম টি...দিব্যি টাইম দিচ্ছিল...বিছানার চাদর ধরে এমন এক টান দিয়েছে যে ঘড়ি একেবারে...'

বারীন চুপ। তটস্থ। ঘড়ির প্রসঙ্গ তাঁর কাছে ষোল আনা অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছনীয়।

'আপনার কী ঘড়ি ?'

'এইচ এম টি।'

'ভালো সার্ভিস দিচ্ছে ?'

'হুঁ।'

'আসলে আমার ঘড়ির লাক্‌টাই খারাপ।'

বারীন ভৌমিক একটা হাই তুলে নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা চোয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মুখ খুলল না। শ্রবণশক্তি লোপ পেলে তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন, কিন্তু তা হবার নয়। 'চ'-এর কথা দিব্যি তাঁর কানে প্রবেশ করছে—

'একটা সুইস ঘড়ি, জানেন—সোনার—ট্র্যাভলিং ক্লক—জিনিভা থেকে এনে দিয়েছিল আমার এক বন্ধু—এক মাসও ব্যবহার করিনি...ট্রেনে যাচ্ছি দিল্লী—বছর আষ্টেক আগে—এই যে আমি-আপনি ট্র্যাভ্‌ল করছি, সেই রকম একটা কামরায় আমরা দুজন—আমি আর একটি ভদ্রলোক—বাঙালী...কী ডেয়ারিং ভেবে দেখুন ! হয়তো বাথরুমে-টাথরুমে গেছি, কি স্টেশন এসেছে, প্ল্যাটফর্মে নেমেছি—আর সেই ফাঁকে ঘড়িটাকে বেমালুম ঝেপে দিল ! অথচ দেখে বোঝার জো নেই—ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে, দিব্যি ভদ্দ্‌রলোকের মতো চেহারা। খুন-টুন যে করে বসেনি এই ভাগ্যি। তারপর থেকে তো আর ট্রেনেই চড়িনি। এবারও প্লেনেই যেতুম, কিন্তু পাইলটদের স্ট্রাইকটা দিল ব্যাগড়া...'

বারীন ভৌমিকের গলা শুক্‌নো, ঠোঁটের চারপাশটা অবশ। অথচ তিনি বেশ

বুঝতে পারছেন যে এতগুলো কথার পর কিছু না বললে অস্বাভাবিক হবে, এমন কি সন্দেহজনকও হতে পারে। প্রাণান্ত চেষ্টা করে, অসীম মনোবল প্রয়োগ করে, অবশেষে কয়েকটি কথা বেরোল মুখ দিয়ে—

'আপনি খোঁ-খোঁজ করেননি ?'

'আ-র খোঁজ ! এসব কি আর খোঁজ করে ফেরত পাওয়া যায় ? তবে লোকটার চেহারা মনে রেখেছিলুম অনেক দিন। এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে। মাঝারি রঙ, গোঁফ আছে, আপনারই মতো হাইট হবে, তবে রোগা। আর একটিবার যদি তার সাক্ষাৎ পেতুম তো বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম। এককালে বক্সিং করতুম, জানেন ? লাইট হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলুম। সে লোকের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে আর দ্বিতীয়বার আমার সামনে পড়েনি...'

ভদ্রলোকের নামটাও মনে পড়ে গেছে। চক্রবর্তী। পুলক চক্রবর্তী। আশ্চর্য ! ওই বক্সিং-এর কথাটা বলামাত্র নামটা সিনেমার টাইটেলের মতো যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন বারীন ভৌমিক। গতবারও বক্সিং নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন পুলক চক্রবর্তী।

কিন্তু নামটা জেনেই বা কী হবে ? ইনি তো আর কোনো অপরাধ করেননি। অপরাধী বারীন নিজে। আর সেই অপরাধের বোঝা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সব স্বীকার করলে কেমন হয় ? ঘড়িটা ফেরত দিলে কেমন হয় ? হাতের কাছে ব্যাগটা খুললেই তো—

দূর—পাগল ! এসব কী চিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বারীন ভৌমিক ? নিজেকে চোর বলে পরিচয় দেবেন ? প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী তিনি, তিনি না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়ার কথা স্বীকার করবেন ? তার ফলে তাঁর নাম যখন ধুলোয় লুটোবে তখন আর গানের ডাক আসবে কোত্থেকে ? তাঁর ভক্তের দলই বা কী ভাববে, কী বলবে ? ইনি নিজেই যে সাংবাদিক নন, বা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত নন, তারই বা গ্যারান্টি কোথায় ? না। স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।

হয়তো স্বীকার করার প্রয়োজনও নেই। পুলক চক্রবর্তী ঘন ঘন চাইছেন তাঁর দিকে। আরো ষোল ঘণ্টা আছে দিল্লী পৌঁছাতে। কোনো এক বীভৎস মুহূর্তে ফস্‌ করে চিনে ফেলার দীর্ঘ সুযোগ পড়ে আছে সামনে। আরে এই তো সেই লোক !—বারীন কল্পনা করলেন তাঁর গোঁফ খসে পড়ে গেছে, গাল থেকে মাংস ঝরে গেছে, চোখ থেকে চশমা খুলে গেছে ; পুলক চক্রবর্তী এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তাঁর ন'বছর আগের চেহারাটার দিকে, তাঁর ঈষৎ কটা চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে, তাঁর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ফুটে উঠছে। হুঁ হুঁ বাছাধন ! পথে এস এবার ! অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি তোমায় ! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখনি...

দশটা নাগাৎ বারীন ভৌমিকের কম্প দিয়ে জ্বর এলো। গার্ডকে বলে তিনি একটি অতিরিক্ত কম্বল চেয়ে নিলেন। তারপর দুটি কম্বল একসঙ্গে পা থেকে নাক অবধি টেনে নিয়ে শয্যা নিলেন। পুলক চক্রবর্তী কামরার দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। বাতি নেভাতে গিয়ে বারীনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। ওষুধ খাবেন ? ভালো বড়ি আছে আমার কাছে, দুটো খেয়ে নিন। এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভ্যাস নেই বোধহয় ?'

ভৌমিক বড়ি খেলেন। একমাত্র ভরসা যে ঘড়ি-চোর বলে চিনতে পারলেও তাঁকে অসুস্থ দেখে অনুকম্পাবশত পুলক চক্রবর্তী কঠিন শাস্তি থেকে বিরত হবেন। একটা ব্যাপার তিনি ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। পুলক তাঁকে চিনতে না পারলেও, কাল দিল্লী পৌঁছবার আগে কোনো এক সুযোগে সুইস ঘড়িটি তার আসল মালিকের বাক্সের মধ্যে চালান দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তো মাঝরাত্রেই কাজটা সারা যেতে পারে। কিন্তু জ্বরটা না কমলে কম্বলের তলা থেকে বেরনো সম্ভব হবে না। এখনো মাঝে মাঝে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে।

পুলক তাঁর মাথার কাছে রীডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁর হাতে খোলা একটা পেপার-ব্যাক বই। কিন্তু তিনি কি সত্যিই পড়ছেন, না বইয়ের পাতায় চোখ রেখে অন্য কিছু চিন্তা করছেন ? বইটা একভাবে ধরা রয়েছে কেন ? পাতা উলটোচ্ছেন না কেন ? কতক্ষণ সময় লাগে পাশাপাশি দুটো পাতা পড়তে ?

এবার বারীন লক্ষ করলেন যে, পুলকের দৃষ্টি বইয়ের পাতা থেকে সরে আসছে। তাঁর মাথাটা ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঘুরল। দৃষ্টি ঘুরে আসছে বারীনের দিকে। বারীন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এখনও কি পুলক চেয়ে আছে তাঁর দিকে ? খুব সাবধানে চোখের পাতা দুটোকে যৎসামান্য ফাঁক করলেন বারীন। আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে নিলেন। পুলক সটান চেয়ে আছে তাঁর দিকে। বারীন অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরে সেই ব্যাঙটা আবার লাফাতে শুরু করেছে। পাঁজরার হাড়ে আবার ধাক্কা পড়ছে—ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...। দাদ্‌রার ছন্দ। ট্রেনের চাকার গম্ভীর ছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সে ছন্দ।

একটা মৃদু 'খচ্‌' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বারীন বুঝতে পারলেন যে কামরার শেষ বাতিটাও নিভে গেছে। এবার সাহস পেয়ে চোখ খুলে বারীন দেখলেন যে দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা ক্ষীণ আলো কামরার অন্ধকারকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। সেই আলোয় দেখা গেল পুলক চক্রবর্তী তাঁর হাতের বইটা বারীনের ব্যাগের পাশে রাখলেন। তারপর কম্বলটাকে একেবারে থুতনি অবধি টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বারীনের মুখোমুখি হয়ে একটা

সশব্দ হাই তুললেন।

বারীন ভৌমিক টের পেলেন তাঁর হৃৎস্পন্দন ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কাল সকালে—হ্যাঁ, কাল সকালে—পুলকের ট্র্যাভলিং ক্লক তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে পুলকের সুটকেসের জামা-কাপড়ের তলায় চালান দিতে হবে। সুটকেসে চাবি লাগানো নেই। একটুক্ষণ আগেই পুলক স্লিপিং সুট বার করে পরেছে। বারীনের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে। বোধহয় ওষুধে কাজ দিয়েছে। কী ওষুধ দিলেন ভদ্রলোক ? নামটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। অসুস্থতার ফলে দিল্লীর সংগীত-রসিকদের বাহবা থেকে যাতে বঞ্চিত না হন, সেই আশায় অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পুলক চক্রবর্তীর দেওয়া বড়ি গিলেছেন তিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...

নাঃ, এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না তিনি। গেলাসের ঠুনঠুনিকে অ্যালার্ম ক্লক ভেবে কী অবস্থা হয়েছিল। এসবের জন্য দায়ী তাঁর অপরাধবোধ-জর্জরিত অসুস্থ মন। কাল সকালে তিনি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। মন খোলসা না হলে গলা খুলবে না, গান বেরোবে না। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন...

চায়ের সরঞ্জামের টুংটাং শব্দে বারীন ভৌমিকের ঘুম ভাঙল। বেয়ারা এসেছে ট্রে নিয়ে চা রুটি মাখন ডিমের অমলেট। এসব তাঁর চলবে কি ? জ্বর আছে কি এখনো ? না, নেই। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে। মোক্ষম ওষুধ দিয়েছিলেন পুলক চক্রবর্তী। ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল বারীনের মনে।

কিন্তু তিনি কোথায় ? বাথরুমে বোধহয়। নাকি করিডরে ? বেয়ারা চলে গেলে পর বারীন বাইরে বেরোলেন। করিডর খালি। কতক্ষণ হল বাথরুমে গেছেন ভদ্রলোক ? একটা চান্স নেওয়া যায় কি ?

বারীন চান্সটা নিলেন বটে, কিন্তু সফল হলেন না। ব্যাগ থেকে ঘড়ি বার করে পুলক চক্রবর্তীর সুটকেস টেনে বার করার জন্য নিচু হতে না হতেই ভদ্রলোক তোয়ালে ও ক্ষৌরীর সরঞ্জাম হাতে কামরায় এসে ঢুকলেন। বারীন ভৌমিক তাঁর ডান হাতটা মুঠো করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'কেমন আছেন ? অলরাইট ?'

'হ্যাঁ। ইয়ে...এটা চিনতে পারছেন ?'

বারীন তাঁর মুঠো খুলে ঘড়ি সমেত হাতটা পুলকের সামনে ধরলেন। তাঁর মনে এখন একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা এসেছে। চুরির ব্যারাম তিনি অনেক দিন কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু এই যে লুকোচুরি, সেটাও তো চুরি ! এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিন্তু-কিন্তু করছি-করব ভাব, এই তলপেট-খালি, গলা-শুকনো, কান-গরম,

বুক-ধুক্‌পুক্‌—এটাও তো একটা ব্যারাম । এটাকে কাটিয়ে না উঠলে নিস্তার নেই, সোয়াস্তি নেই ।

পুলক চক্রবর্তী হাতের তোয়ালের একটা অংশ তাঁর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে সবেমাত্র কানের মধ্যে গুঁজেছিলেন, এমন সময় বারীনের হাতে ঘড়িটা দেখে হাত তাঁর কানেই রয়ে গেল । বারীন বললেন, 'আমিই সেই লোক । মোটা হয়েছি, গোঁফটা কামিয়েছি, আর চশমা নিয়েছি । আমি পাটনা যাচ্ছিলাম, আপনি দিল্লী । সিক্সটি-ফোরে । সেই যে একটি লোক কাটা পড়ল, আপনি দেখতে নামলেন, সেই সুযোগে আমি ঘড়িটা নিয়ে নিই ।'

পুলকের দৃষ্টি এখন ঘড়ি থেকে সরে গিয়ে বারীনের চোখের উপর নিবদ্ধ হল । বারীন দেখলেন তাঁর কপালের মাঝখানে নাকের উপর দুটো সমান্তরাল খাঁজ, চোখের সাদা অংশটা অস্বাভাবিক রকম প্রকট, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে কিছু বলার জন্য তৈরি হয়েও কিছু বলতে পারছে না । বারীন বলে চললেন—

'আসলে ওটা আমার একটা ব্যারাম, জানেন । মানে, আমি আসলে চোর নই । ডাক্তারিতে এর একটা নাম আছে, এখন মনে পড়ছে না । যাই হোক, এখন আমি একেবারে, মানে, নরম্যাল । ঘড়িটা অ্যাদ্দিন ছিল, ব্যবহার করেছি, আজও সঙ্গে রয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—প্রায় মিরাক্‌লের মতো—তাই আপনাকে ফেরত দিচ্ছি । আশা করি আপনার মনে কোনো...ইয়ে থাকবে না ।'

পুলক চক্রবর্তী একটা অস্ফুট 'থ্যাঙ্কস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না । তাঁর হারানো ঘড়ি তাঁর নিজের কাছে ফিরে এসেছে, হতভম্বভাবে সেটি হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন । বারীন তাঁর ব্যাগ থেকে দাঁতের মাজন, টুথব্রাশ ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বার করে তোয়ালেটা র‍্যাক্‌ থেকে নামিয়ে নিয়ে কামরার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন । বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নজরুলের 'কত রাতি পোহায় বিফলে' গানের খানিকটা গেয়ে বুঝলেন যে তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সাবলীলতা তিনি ফিরে পেয়েছেন ।

ফাইনান্সের এন. সি. ভৌমিককে টেলিফোনে পেতে প্রায় তিন মিনিট সময় লাগল । শেষে একটা পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল 'হ্যালো' ।

'কে, নীতীশদা ? আমি ভোঁদু ।'

'কীরে, তুই এসে গেচিস ? আজ যাব তোর গলাবাজি শুনতে । তুইও একটা কেউকেটা হয়ে গেলি শেষটায় ? ভাবা যায় না !...যাক, কী খবর বল্‌ । হঠাৎ নীতীশদাকে মনে পড়ল কেন ?'

'ইয়ে—পুলক চক্রবর্তী বলে কাউকে চিনতে ? তোমার সঙ্গে নাকি স্কটিশে

পড়ত । বক্সিং করত ।'

'কে, ঝাড়ুদার ?'

'ঝাড়ুদার ?'

'ও যে সব জিনিসপত্তর ঝেড়ে দিত । এর-ওর ফাউন্টেন পেন, লাইব্রেরির বই, কমন-রুম থেকে টেবিল টেনিস ব্যাট । আমার প্রথম রনসনটা তো ওই ঝেড়েছিল । অথচ অভাব-টভাব নেই, বাপ রিচ ম্যান । ওটা এক ধরনের ব্যারাম, জানিস তো ?'

'ব্যারাম ?'

'জানিস না ? ক্লেপ্‌টোমেনিয়া । কে-এল-ই-পি...'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বারীন ভৌমিক তাঁর খোলা সুটকেসটার দিকে দেখলেন । হোটেলে এসে সুটকেস খুলতেই কিছু জিনিসের অভাব তিনি লক্ষ করেছেন । এক কার্টন থ্রী কাস্‌লস সিগারেট, একটা জাপানী বাইনোকুলার, পাঁচটা একশো টাকার নোট সমেত একটা মানি-ব্যাগ ।

ক্লেপ্‌টোমেনিয়া । বারীন নামটা জানতেন, কিন্তু ভুলে গেছিলেন । আর ভুলবেন না ।

ভূতো

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রূরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। অক্রূর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ, কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রূরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হরনাথ, কেমন আছ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'রাগ সংগীত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।'

'গান করো?'

'আজ্ঞে না।'

'যন্ত্র সংগীত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী যন্ত্র? সেতার?'

'আজ্ঞে না।'

'সরোদ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কী বাজাও?'

'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রূরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রূর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না? নবীনের পড়াশুনায় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অক্রূর চৌধুরীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল যে অক্রূরবাবু থাকেন কলকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন বলল, সে কী করে।

'এই সব শখ হয়েছে কেন?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল।—'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রূরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায়নি। যদি পার তো নিজে চেষ্টা করে দেখ।'

নবীন সেদিনের মতো উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট

লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌মের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রূরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরো বিপর্যয়। এবার অক্রূরবাবু একরকম বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাবো না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝোনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনোরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুসড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রূর চৌধুরী। সে যদি না শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প বর্গের প ফ ব ভ ম, কেবল এই ক'টা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই ক'টা অক্ষর না থাকলে যে কোনো কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অথচ না নাড়িয়ে বলা যায়। কোনো কথায় প বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ' কথাটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে বলা যায়, তাহলে আর ঠোঁট নাড়াবার কোনো দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ ম-য়ের জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ?' 'ভালো আছি,' 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।'—তাহলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ?' 'ঘালো আছি, 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে তাই না?' 'তা কড়েছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা'।

আরো আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্ট্রিলোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় জাদুকর। মনে হয় জাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন পনের ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রূর চৌধুরীর মতো। অর্থাৎ অক্রূর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্রূর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল।—'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্রূর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটাও অক্রূর চৌধুরীর মতো; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল; তাদের একটা ফাংশনে শশধরকে ধরে তার ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌মের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হচ্ছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টগেংগল আর ঙোহনগাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষই করেনি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনো চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রূর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথাবার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রূরবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন।

সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জানো তো ভূতো?'

'কই, না তো।'

'সে কী, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জানো না?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কী?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসট্রামে ভিড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রূরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অক্রূরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অক্রূরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রূরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলেনি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে?'

অক্রূরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধহয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রূরবাবু এখনো ভূতোর দিক থেকে চোখ সরাননি। বললেন, 'তুমি জানো

কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে কর? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব?'

সময়টা সন্ধ্যা। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রূরবাবুর চোখ দুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেই ভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক।

'তুমি জানো কি না জানি না,' বললেন অক্রূরবাবু, 'ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌মেই কিন্তু আমার জাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয়; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে জাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনো?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে জাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেন্ট্রিলোকুইজম যেমন তোমাকে আমি শেখাইনি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায়নি। পেশাদারী জাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনোদিনই শেখায়নি। ম্যাজিকের রাস্তা জাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রূরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ। .. যাক, আমি তাহলে আসি।'

অক্রূরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ করেনি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিয়ে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ চোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভালো করে দেখেনি।

কিন্তু তাও মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে

কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেঝেতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া?'

আদিনাথ পাল ভারী অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেননি। বললে কাঁচা পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনো অসুবিধে ছিল না। দু'রকম চুলই তো আছে স্টকে; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি?'

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে; আপনি টের পাননি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোড শেডিং নিয়ে রসাল কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সব সময় তৈরি কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরিজি শব্দ ঢুকে পড়ছে যেগুলো নবীন কখনো ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারী পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরিজি কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভালো লাগেনি। তার সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য একজন কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ করেছে অক্রূরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখে পড়ার মতো নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেই সঙ্গে আরো কিছু।

আরো খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।

এই কালি আগে ঠিক ছিল না।

নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারী অস্থির

লাগছে। ম্যাজিকের পূজারী সে, কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অশুভ। ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে কোনো পুতুলের মতোই অসাড়, নির্জীব।

অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে পরিবর্তনগুলো অক্রূর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়ছে।

ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম থেকেই যেমন—

'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো ?'

'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'

'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'

'কুতুলের আগার ঘাঙ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !'

আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।—

'এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো ?'

উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

'কর্ণ্ডখল, কর্ণ্ডখল !'

কর্মফল।

নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে, যেমন হয় স্টেজে, কিন্তু উত্তরটা তার জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।

সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিচ্ছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালোই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। এগারোটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে।

ঘরে কে কাশল ?

সে নিজে কি ? কিন্তু তার তো কাশি হয়নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা জ্বালালো নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।

নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্ ঠক্। দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়িতে কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রীটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল, এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কথক নাচ ও তারপর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্য যা করার সবই করেছে নবীন। গলাটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, কারণ সূক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমন কি ভূতোকে প্রথম প্রশ্ন করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছাবে না, কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লীজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তাই তাঁরা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি

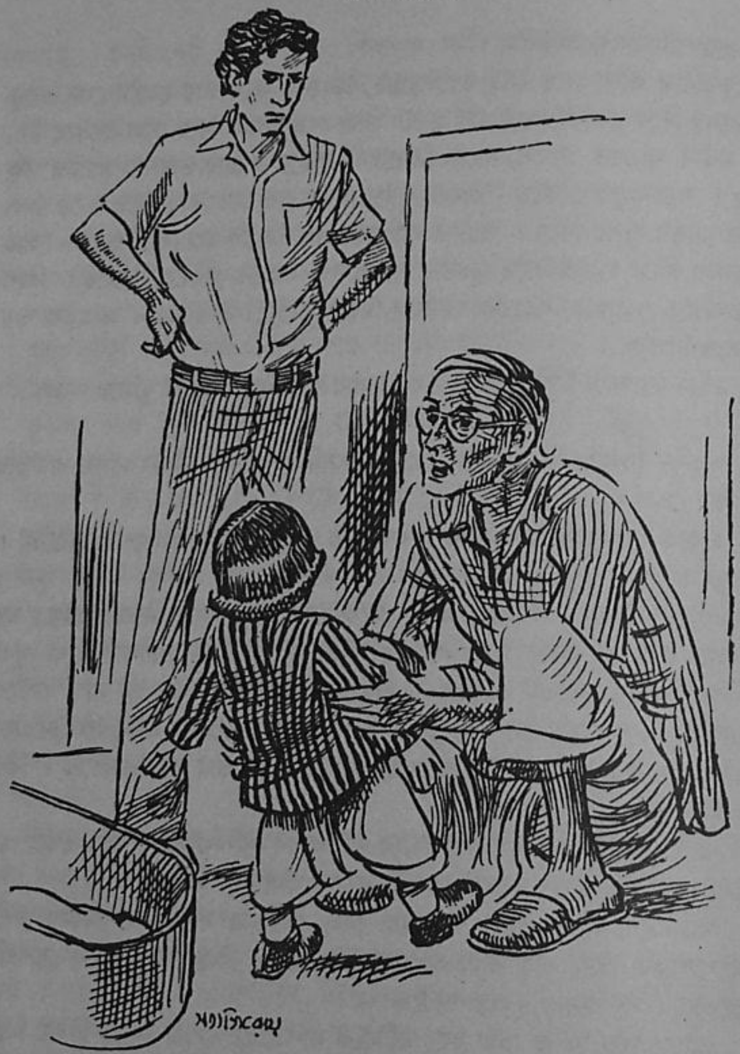

ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমতো অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তার পুতুলের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময়, কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্য যেন তার জেদ চেপে গেছে।

দু'পা-র বেশি এগোনো সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তার চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি!

হ্যাঁ, যাচ্ছে বৈ কি। ট্র্যাফিক-বিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির বদলে দুটি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো!'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোষের দিকে—

'ভূতো নয়! আমি অক্রূর চৌধুরী!'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রূর চৌধুরী কোনো এক আশ্চর্য জাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায়নি। এই জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা?

চাপ বাড়াতে গিয়ে ভূতোর মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

*   *   *

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়,' বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রূর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি?'—নবীন এখনো কাগজ দেখেনি।—'কিসে গেলেন?'

'হৃদ্‌রোগ', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাৎ জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গত কাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

সাধনবাবুর সন্দেহ

সাধনবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন মেঝেতে একটা বিঘতখানেক লম্বা সরু গাছের ডাল পড়ে আছে। সাধনবাবু পিটপিটে স্বভাবের মানুষ। ঘরে যা সামান্য আসবাব আছে—খাট, আলমারি, আলনা, জলের কুঁজো রাখার টুল—তার কোনোটাতে এক কণা ধুলো তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ফুলকারি করা টেবিল ক্লথ—সবই তক্‌তকে হওয়া চাই। এতে ধোপার খরচটা বাড়ে, কিন্তু সেটা সাধনবাবু গা করেন না। আজ ঘরে ঢুকেই গাছের ডাল দেখে তাঁর নাক কুঁচকে গেল।

'পচা!'

চাকর পচা মনিবের ডাকে এসে হাজির।

'বাবু, ডাকছিলেন?'

'কেন, তোর কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'না বাবু, তা হবে কেন?'

'মেঝেতে গাছের ডাল পড়ে কেন?'

'তা তো জানি না বাবু। কাক-চড়ুইয়ে এনে ফেলেছে বোধহয়।'

'কেন, ফেলবে কেন? কাক-চড়ুই তো ডাল আনবে বাসা বাঁধার জন্য। সে ডাল মাটিতে ফেলবে কেন? ঝাড়ু দেবার সময় লক্ষ করিসনি এটা? নাকি ঝাড়ুই দিসনি?'

'ঝাড়ু আমি রোজ দিই বাবু। যখন দিই তখন এ-ডাল ছিল না।'

'ঠিক বলছিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।'

'তাজ্জব ব্যাপার তো!'

পরদিন সকালে আপিসে যাবার আগে একটা চড়ুইকে তাঁর জানালায় বসতে দেখে সাধনবাবুর সন্দেহ হল ইনিই বাসা বাঁধার ফিকির খুঁজছেন। কিন্তু কোথায় ? ঘরের মধ্যে জায়গা কোথায় ? ঘুলঘুলিতে কি ? তাই হবে।

তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সাতখানা ঘরের মধ্যে তাঁর ঘরের দিকেই চড়ুই-এর দৃষ্টি কেন এই নিয়েও সাধনবাবুর মনে খট্‌কা লাগল। এমন কিছু আছে কি তাঁর ঘরে যা পাখিদের অ্যাট্রাক্ট করতে পারে ?

অনেক ভেবে সাধনবাবুর সন্দেহ হল—ওই যে নতুন কবরেজী তেলটা তিনি ব্যবহার করেছেন—যেটা দোতলার শখের কবিরাজ নীলমণিবাবুর মতে খুস্‌কির মহৌষধ—সেটার উগ্র গন্ধই হয়তো পাখিদের টেনে আনছে। সেই সঙ্গে এমনও সন্দেহ হল যে এটা হয়তো নীলমণিবাবুর ফিচলেমি, সাধনবাবুর ঘরটাকে একটা পক্ষিনিবাসে পরিণত করার মতলবে তিনি এই তেলের গুণগান করছেন। ...

আসলে সতেরর-দুই মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটবাড়ির সকলেই সাধনবাবুর সন্দেহ বাতিকের কথা জানেন, এবং আড়ালে এই নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। আজ কী কী সন্দেহের উদয় হল আপনার মনে ?'—এ জাতীয় প্রশ্ন দিনের শেষে সাধনবাবুকে প্রায়ই শুনতে হয়।

শুধু প্রশ্ন নয়, অন্যভাবেও তাঁকে নিয়ে লেগ-পুলিং চলে। একতলার নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে সন্ধ্যায় তিন-মাসের আড্ডা বসে। সাধনবাবু তাতে নিয়মিত যোগদান করেন। সেদিন যেতে নবেন্দুবাবু তাঁকে একটা দলা পাকানো কাগজ দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন তো মশাই, এ থেকে কিছু সন্দেহ হয় কিনা। এটা জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।'

আসলে কাগজটা নবেন্দুবাবুরই মেয়ে মিনির অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা। সাধনবাবু কাগজটাকে খুলে সেটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'এটা তো সংখ্যা দিয়ে লেখা কোনো সাংকেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে।'

নবেন্দুবাবু কিছু না বলে চুপটি করে চেয়ে রইলেন সাধনবাবুর দিকে।

'কিন্তু এটার তো মানে করা দরকার,' বললেন সাধনবাবু। 'ধরুন এটা যদি কোনো হুমকি হয়, তাহলে...'

সংকেতের পাঠোদ্ধার হয়নি অবশ্য। কিন্তু সেটা বড় কথা নয় ; কথা হল, এই কাগজের দলা থেকে সাধনবাবুর সন্দেহ কোন কোন দিকে যেতে পারে সেইটে দেখা। সাধনবাবু বিশ্বাস করেন যে গোটা কলকাতা শহরটাই হল ঠক জুয়াচোর ফন্দিবাজ মিথ্যেবাদীর ডিপো। কারুর উপর ভরসা নেই, কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। এই অবস্থায় একমাত্র সন্দেহই মানুষকে সামলে চলতে সাহায্য করতে পারে।

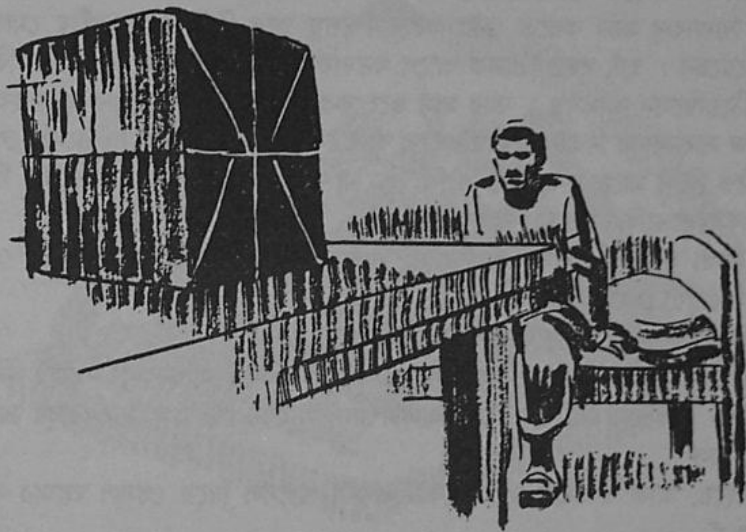

এই সাধনবাবুই একদিন আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের উপর একটা বশ বড় চার-চৌকো কাগজের মোড়ক দেখতে পেলেন। তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হল সেটা ভুল করে তাঁর ঘরে চলে এসেছে। এহেন মোড়ক তাঁকে কে পাঠাবে ? তিনি তো এমন কোনো পার্সেল প্রত্যাশা করেননি !

কাছে গিয়ে যখন দেখলেন যে মোড়কের উপর তাঁর নাম নেই, তখন সন্দেহটা আরো পাকা হল।

'এটা কে এনে রাখল রে ?' চাকর পচাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন সাধনবাবু।

'আজ্ঞে একজন লোক ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে গেছে দুপুরে এসে। আপনার নাম করে বলেছে আপনারই জিনিস।'

ধনঞ্জয় একতলার ষোড়শীবাবুর চাকর।

'কী আছে এতে, কে পাঠিয়েছে, সেসব কিছু বলেছে ?'

'আজ্ঞে তা তো বলেনি।'

'বোঝো !'

সাধনবাবু কাঁধের চাদরটা আলনায় রেখে খাটে বসলেন। রীতিমতো বড় মোড়ক। প্রায় একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল ঢুকে যায় ভিতরে। অথচ কে পাঠিয়েছে জানার কোনো উপায় নেই।

সাধনবাবু খাট থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে মোড়কটা হাতে তুললেন। বেশ

ভারী। কমপক্ষে পাঁচ কিলো।

সাধনবাবু মনে করতে চেষ্টা করলেন শেষ কবে তিনি এই জাতীয় মোড়ক পেয়েছেন। হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে খড়দায় তাঁর এক মাসীমা থাকতেন, তিনি পাঠিয়েছিলেন আমসত্ত্ব। তার মাস ছয়েকের মধ্যেই সেই মাসীমার মৃত্যু হয়। আজ সাধনবাবুর নিকট আত্মীয় বলতে আর কেউই অবশিষ্ট নেই। পার্সেল কেন, চিঠিও তিনি মাসে দু-একটার বেশি পান না। এই মোড়কের সঙ্গে একটা চিঠি থাকা অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু তাও নেই।

কিম্বা হয়তো ছিল। সাধনবাবুর সন্দেহ হল ধনঞ্জয়ের অসাবধানতা হেতু সেটি খোয়া গেছে।

একবার ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তাকে ডেকে পাঠানো অনুচিত হবে মনে করে সাধনবাবু নিজেই নিচে গেলেন। ধনঞ্জয় উঠোনে বসে হামানদিস্তায় কী যেন ছেঁচছিল, সাধনবাবুর ডাকে উঠে এল।

'ইয়ে, আজ তোমার হাতে কেউ একটা পার্সেল দিয়ে গেস্‌ল আমার নাম করে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সঙ্গে চিঠি ছিল?'

'কই না তো।'

'কোত্থেকে আসছে সেটা বলেছিল?'

'মদন না কী জানি একটা নাম বললেন।'

'মদন?'

'তাই তো বললেন।'

মদন নামে কাউকে চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না সাধনবাবু। কী বলতে কী বলছে লোকটা কে জানে। ধনঞ্জয় যে একটি গবেট সে সন্দেহ অনেকদিনই করেছেন সাধনবাবু।

'চিঠিপত্তর কাগজটাগজ কিছু ছিল না সঙ্গে?'

'একটা কাগজ ছিল, তাতে বাবু সই করে দিলেন।'

'কে, ষোড়শীবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিন্তু ষোড়শীবাবুকে জিজ্ঞেস করেও কোনো ফল হল না। একটা চিরকুটে তিনি সাধনবাবুর হয়ে সই করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা কোথা থেকে এসেছিল খেয়াল করেননি।

সাধনবাবু আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন। কার্তিক মাসের সন্ধ্যা, শীতটা

এর মধ্যে বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। সামনে কালীপুজো, তার তোড়জোড় যে চলছে সেটা মাঝে মাঝে বোমা-পটকার—

'দুম্!'

পাড়াতেই একটা বোমা ফেটেছে। আর সেই মুহূর্তে খাটে বসা সাধনবাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

টাইম-বোমা!

ওই মোড়কের মধ্যে টাইম-বোমা নেই তো, যেটা নির্দিষ্ট সময়ে ফেটে তাঁর ইহজগতের লীলা সাঙ্গ করে দেবে?

এই টাইম-বোমার কথা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদীদের এটা একটা প্রধান অস্ত্র।

কিন্তু তাঁকে বোমা পাঠাবে কে, কেন?

প্রশ্নটা মনে আসতেই সাধনবাবু উপলব্ধি করলেন যে ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে তাঁর শত্রুর অভাব নেই। কনট্র্যাক্ট পাবার জন্য তোষামোদ ধরাধরি তাঁকেও করতে হয়, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদেরও করতে হয়। যদি তিনি পেয়ে যান সে কনট্র্যাক্ট, তাহলে অন্যেরা হয়ে যায় তাঁর শত্রু। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

'পচা!'

ডাকটা দিয়েই বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাও পচা হাজির।

'বাবু, ডাকলেন ?'

'ইয়ে—'

কিন্তু কাজটা কি ভালো হবে ? সাধনবাবু ভেবেছিলেন পচাকে বলবেন পার্সেলে কান লগিয়ে দেখতে টিক্‌টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। টাইম-বোমার সঙ্গে কলকব্জা লাগানো থাকে, সেটা টিক্‌টিক্ শব্দে চলে। সেই টিক্‌টিক্‌-ই একটা পূর্বনির্ধারিত বিশেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পরিণত হয়।

পচা যখন কান লাগাবে, তখনই যদি বোমাটা—

সাধনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। এদিকে পচা বাবুর আদেশের জন্য দাঁড়িয়ে আছে ; সাধনবাবুকে বলতেই হল যে তিনি ভুল করে ডেকেছিলেন, তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

এই রাতটা সাধনবাবু ভুলবেন না কোনোদিন। অসুখবিসুখে রাত্রে ঘুম হয় না এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু চরম আতঙ্কে এই শীতকালে ঘর্মাক্ত অবস্থায় সারারাত ঠায় বিছানায় বসে কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত যখন বোমা ফাটল না, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সাধনবাবু স্থির করলেন যে আজই সন্ধ্যায় মোড়কটা খুলে দেখতে হবে তার মধ্যে কী আছে। তাঁর নিজেরও মনে হয়েছে যে তাঁর সন্দেহটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সাধনবাবুর আর মোড়ক খোলা হল না।

অনেক লোক আছে যারা খবরের কাগজের আদ্যোপান্ত না পড়ে পারে না। সাধনবাবু এই দলে পড়েন না। প্রথম এবং মাঝের পাতার খবরগুলোর শিরোনামায় চোখ বুলিয়েই তাঁর কাগজ পড়া হয়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই উত্তর কলকাতায় খুনের খবরটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আপিস থেকে ফিরে একতলায় নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে একটা বড় রকম দাপাদাপি চলছে শুনে কারণ জিজ্ঞেস করে তিনি ঘটনাটা জানতে পারলেন।

পটুয়াটোলা লেনে খুন, হত ব্যক্তির নাম শিবদাস মৌলিক। কথাটা শুনেই সাধনবাবুর একটা সুপ্ত স্মৃতি খোঁচা খেয়ে জেগে উঠল।

এক মৌলিককে তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। তার প্রথম নাম শিবদাস কি ? হতেও পারে। সাধনবাবু তখন থাকতেন ওই পটুয়াটোলা লেনেই। মৌলিক ছিল তাঁর প্রতিবেশী। তিন-তাসের আড্ডা বসতো মৌলিকের ঘরে

রোজ সন্ধ্যায়। মৌলিককে কেন জানি মৌলিক বলেই ডাকত সবাই। আরো দুজন ছিলেন আড্ডায়। সুখেন দত্ত আর মধুসূদন মাইতি। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মতো সাংঘাতিক চরিত্র সাধনবাবু আর দেখেননি। তাসের খেলায় সে যে জুয়াচুরির রাজা সে সন্দেহ সাধনবাবুর গোড়া থেকেই হয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে একদিন সন্দেহটা প্রকাশ করতে হল। এতে মধু মাইতির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভয়াবহ। তার পকেটে সব সময়ই যে একটি চাকু অবস্থান করে সেটা সেদিনই জানতে পেরেছিলেন সাধনবাবু। তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন মৌলিক আর সুখেন দত্তর জন্য। ব্যবসায় উন্নতির পর সাধনবাবু পটুয়াটোলা লেনের খোলার ঘর ছেড়ে চলে আসেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে। আর সেই থেকেই মৌলিক এন্ড কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাসের নেশাটা তিনি ছাড়তে পারেননি, আর সেই সঙ্গে তাঁর সন্দেহ বাতিকটাও। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে পরিবর্তন হয়েছিল বিস্তর। পোশাকে পারিপাট্য, বিড়ি ছেড়ে উইল্‌স সিগারেট ধরা, নীলামের দোকান থেকে মাঝে মাঝে শখের জিনিস কিনে এনে ঘর সাজানো—পেন্টিং, ফুলদানি, বাহারের অ্যাশট্রে—এসবই গত পাঁচ-সাত বছরের ঘটনা।

এই খুনের ঘটনার শিবদাস মৌলিক যদি সেই মৌলিক হয়, তাহলে খুনী যে মধু মাইতি সে বিষয়ে সাধনবাবুর কোনো সন্দেহ নেই।

'খুনটা কী ভাবে হল ?' সাধনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'নৃশংস,' বললেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'লাশ সনাক্ত করার কোনো উপায় ছিল না। পকেটে একটা ডায়রি থেকে নাম জেনেছে।'

'কেন, কেন ? সনাক্ত করার উপায় ছিল না কেন ?'

'ধড় আছে, মুড়ো নেই। সনাক্ত করবে কী করে ?'

'মুড়ো নেই মানে ?'

'মুণ্ডু ঘ্যাচাং !' জোড়া হাত মাথার উপর তুলে আবার ঝটিতি নামিয়ে এনে খাঁড়ার কোপের অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'খুনি' যে কোথায় সরিয়ে রেখেছে মুণ্ডু সেটা এখনো জানা যায়নি।'

'খুনী কে সেটা জানা গেছে ?'

'তিন-তাসের বৈঠক বসত এই মৌলিকের ঘরে। তাদেরই একজন বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।'

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে সাধনবাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সেদিনের ঘটনা চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছেন তিনি—যেদিন তিনি মধু মাইতিকে জোচ্চুরির অপবাদ দিয়েছিলেন। চাকুর আক্রমণ থেকে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বেশ কিছুক্ষণ

পর অবধি মধু মাইতির দৃষ্টি তাঁর উপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল সেটা মনে আছে। আর মনে আছে মধুর একটি উক্তি—'আমায় চেন না তুমি, সাধন মজুমদার!—আজ পার পেলে, কিন্তু এর বদলা আমি নোব, সে আজই হোক, আর দশ বছর পরেই হোক।'

রক্ত-জল-করা শাসানি। সাধনবাবু ভেবেছিলেন পটুয়াটোলা লেন থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, কিন্তু—

কিন্তু ওই মোড়ক যদি মধু মাইতি দিয়ে গিয়ে থাকে? মদন!—ধনঞ্জয় বলেছিল মদন। ধনঞ্জয় যে কানে খাটো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মধু আর মদনে খুব বেশি পার্থক্য আছে কি? মোটেই না। মধু অথবা মধুর লোকই রেখে গেছে ওই পার্সেল, আর সেটা যাতে সত্যিই তাঁর হাতে পৌঁছায় তাই চিরকুটে সই করিয়ে নিয়েছে।

ওই মোড়কের ভিতরে রয়েছে শিবদাস মৌলিকের মাথা!

এই সন্দেহ সিঁড়ির মাথা থেকে তাঁর ঘরের দরজার দূরত্বটুকু পেরোবার মধ্যে দৃঢ় ভাবে সাধনবাবুর মনে গেঁথে গেল। দরজা থেকেই দেখা যায় টেবিলের উপর ফুলদানিটার পাশে রাখা মোড়কটাকে। মোড়কের ওজন এবং আয়তন দুইই এখন স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে তার ভিতরে কী আছে।

বাবু দোড়গোড়ায় এসে থেমে গেছেন দেখে পচা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল; সাধনবাবু প্রচণ্ড মনের জোর প্রয়োগ করে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে চাকরকে চা আনতে বললেন।

'আর, ইয়ে, আজ কেউ এসেছিল? আমার খোঁজ করতে?'

'কই না তো।'

'হুঁ।'

সাধনবাবু অবশ্য সন্দেহ করেছিলেন পুলিশ হয়তো এরই মধ্যে হানা দিয়ে গেছে। তাঁর ঘরে খুন হওয়া ব্যক্তির মুণ্ডু পেলে তাঁর যে কী দশা হবে সেটা ভাবতে তাঁর আরেক দফা ঘাম ছুটে গেল।

গরম চা পেটে পড়তে সামান্য বল যেন ফিরে এল মনে। যাক্—অন্তত টাইম-বোমা তো নয়।

কিন্তু এও ঠিক যে এই মুণ্ডুসমেত মোড়কটিকে সামনে রেখে যদি তাঁকে সারা রাত জেগে বসে থাকতে হয় তাহলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

ঘুমের বড়িতে ঘুম হল ঠিকই, কিন্তু দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। একবার দেখলেন মুণ্ডুহীন মৌলিকের সঙ্গে বসে তিন-তাস খেলছেন তিনি, আরেকবার দেখলেন মৌলিকের ধড়বিহীন মুণ্ডু তাঁকে এসে বলছে, 'দাদা,—ওই বাক্সে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠছে। দয়া করে মুক্তি দিন আমায়।'

বড়ি খাওয়া সত্ত্বেও চিরকালের অভ্যাস মতো সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল সাধনবাবুর। হয়তো ব্রাহ্ম মুহূর্তের গুণেই সংকট মোচনের একটা উপায় সাধনবাবুর মনে উদিত হল।

মুণ্ডু যখন তাঁর কাছে পাচার করা হয়েছে, তখন সে-মুণ্ডু অন্যত্র চালান দিতে বাধাটা কোথায়? তাঁর ঘর থেকে জিনিসটাকে বিদায় করতে পারলেই তো নিশ্চিন্তি।

ভোর থাকতেই অন্য কাজ সারার আগে বাজারের থলিতে মোড়কটা ভরে নিয়ে সাধনবাবু বেরিয়ে পড়লেন। প্যাকিংটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে, কারণ ভিতরের রক্ত চুঁইয়ে থাকলেও তার বিন্দুমাত্র বাক্স ভেদ করে বাইরের কাগজে ছোপ ফেলেনি।

বাসে উঠে কালীঘাট পৌঁছাতে লাগল পঁচিশ মিনিট। তারপর পায়ে হেঁটে আদিগঙ্গায় পৌঁছে একটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে হাতের মোড়কটাকে সবেগে ছুঁড়ে ফেললেন নদীর মাঝখানে।

ঝপাৎ—ডুবুস্!

মোড়ক নিশ্চিহ্ন, সাধনবাবু নিশ্চিন্ত।

* *

বাড়ি ফিরতে লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট। সদর দরজা দিয়ে যখন ঢুকছেন তিনি তখন ষোড়শীবাবুর দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে।

আর সেই ঘড়ির শব্দ শুনেই সাধনবাবু মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলেন।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তাঁর। কদিন থেকেই বার বার সন্দেহ হয়েছে তিনি যেন কী একটা ভুলে যাচ্ছেন। পঞ্চাশের পর এ জিনিসটা হয়। একথা নীলমণিবাবুকে বলতে তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মীশাক খেতে বলেছিলেন।

আজ আধ ঘন্টা আগেই বেরিয়ে পড়তে হল সাধনবাবুকে, কারণ যাবার পথে একটা কাজ সেরে যেতে হবে।

রাসেল স্ট্রীটে নীলামের দোকান মর্ডান এক্সচেঞ্জে ঢুকতেই একগাল হেসে এগিয়ে এলেন মালিক তুলসীবাবু।

'টেবিল ক্লকটা চলছে তো?'

'ওটা পাঠিয়েছিলেন আপনি?'

'বা রে, আমি তো বলেইছিলাম পাঠিয়ে দেব। সেটা পৌঁছায়নি আপনার হাতে?'

'হ্যাঁ, মানে, ইয়ে—'

'আপনি পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে গেলেন, এত পছন্দ আপনার, আপনি

পুরোনো খদ্দের—কথা দিয়ে কথা রাখব না ?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই—'

'দেখবেন ফার্স্ট ক্লাস টাইম রাখবে ও ঘড়ি। নামকরা ফরাসী কোম্পানি তো ! জিনিসটা জলের দরে পেয়ে গেছেন। ভেরি লাকি !'

তুলসীবাবু অন্য খদ্দেরের দিকে এগিয়ে যেতে সাধনবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। জলের দরের ঘড়ি জলেই গেল !

ভালো বদলা নিয়েছে মধু মাইতি তাতে সন্দেহ নেই। আর 'মডার্ন'কেই যে 'মদন' শুনেছে ধনঞ্জয় তাতেও কোনো সন্দেহ আছে কি ?

অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু

টিপু ভূগোলের বইটা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে দেখল। সাতচল্লিশ মিনিট পড়া হয়ে গেছে একটানা। এখন তিনটে বেজে তেরো মিনিট। এবার যদি ও একটু ঘুরে আসে তাহলে ক্ষতি কী ? ঠিক এমনি সময় তো সেদিন লোকটা এসেছিল। সে তো বলেছিল টিপুর দুঃখের কারণ হলে তবে আবার আসবে। তাহলে ? কারণ তো হয়েছে। বেশ ভালো রকমই হয়েছে। যাবে নাকি একবার বাইরে ?

নাঃ। মা বারান্দায় বেরিয়েছেন কিসের জন্য জানি। হুস করে একটা কাক তাড়ালেন এক্ষুনি। তারপর ক্যাঁচ শব্দটায় মনে হল বেতের চেয়ারটায় বসলেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

লোকটার কথা মনে পড়ছে টিপুর। এমন লোক টিপু কোনোদিন দেখেনি। ভীষণ বেঁটে, গোঁফদাড়ি নেই, কিন্তু বাচ্চা নয়। বাচ্চাদের এমন গম্ভীর গলা হয় না। তাহলে লোকটা বুড়ো কি ? সেটাও টিপু বুঝতে পারেনি। চামড়া কুঁচকোয়নি কোথাও। গায়ের রং চন্দনের সঙ্গে গোলাপী মেশালে যেমন হয় তেমনি। টিপু মনে মনে ওকে গোলাপীবাবু বলেই ডাকে। লোকটার আসল নাম টিপু জানে না। জানতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা বলল, 'কী হবে জেনে ? আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার জিভ জড়িয়ে যাবে।'

টিপু বেশ রেগে গিয়েছিল। 'কেন, জড়িয়ে যাবে কেন ? আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলতে পারি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলতে পারি, এমন-কি ফ্লক্সিনসিনিহিলিপিলিফিকেশন বলতে পারি, আর তোমার নাম বলতে পারব না ?' তাতে লোকটা বলল, 'একটা জিভে আমার নাম উচ্চারণ হবে না।'

'তোমার বুঝি একটার বেশি জিভ আছে ?' জিজ্ঞেস করেছিল টিপু।

'বাংলা বলতে একটার বেশি দরকার হয় না।'

বাড়ির পিছনে যে নেড়া শিরীষ গাছটা আছে, তারই নীচে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। এদিকটা বড় একটা কেউ আসে না। শিরীষ গাছটার পিছনে খোলা মাঠ, তারও পিছনে ধান ক্ষেত, আর তারও অনেক, অনেক পিছনে পাহাড়ের সারি। কদিন আগেই টিপু এদিকটায় এসে একটা ঝোপের ধারে একটা বেজিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল। আজ হাতে কিছু পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে এসেছিল ঝোপটার ধারে ছড়িয়ে দেবার জন্য, যদি তার লোভে বেজিটা আবার দেখা দেয়। এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল গাছতলায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। চোখাচুখি হতেই লোকটা ফিক্ করে হেসে বলল, 'হ্যালো।'

সাহেব নাকি ? সাহেব হলে কথা বলে বেশিদূর এগোনো যাবে না, তাই টিপু কিছুক্ষণ কিছু না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার লোকটাই ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার কোনো দুঃখ আছে ?'

'দুঃখ ?'

'দুঃখ।'

টিপু তো অবাক। এমন প্রশ্ন তাকে কেউ কোনোদিন করেনি। সে বলল, 'কই, না তো। দুঃখ তো নেই।'

'ঠিক বলছ ?'

'বা রে, ঠিক বলব না কেন ?'

'তোমার তো দুঃখ থাকার কথা। হিসেব করে তো তাই বেরোল।'

'কী রকম দুঃখ ? ভেবেছিলাম বেজিটাকে দেখতে পাব, কিন্তু পাচ্ছি না। সেরকম দুঃখ ?'

'উহুঁ উহুঁ। যে-দুঃখে কানের পিছনটা নীল হয়ে যায়, হাতের তেলো শুকিয়ে যায়, সেরকম দুঃখ।'

'মানে ভীষণ দুঃখ ?'

'হ্যাঁ।'

'না, সেরকম দুঃখ নেই।'

লোকটা এবার নিজে দুঃখ দুঃখ ভাব করে মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, তাহলে এখনো মুক্তি নেই।'

'মুক্তি ?'

'মুক্তি। ফ্রীডম।'

'ফ্রীডম মানে মুক্তি সেটা আমি জানি,' বলল টিপু। 'আমার দুঃখ হলে বুঝি তোমার মুক্তি হবে ?'

লোকটা টিপুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, 'তোমার বয়স সাড়ে দশ ?'

'হ্যাঁ,' বলল টিপু।

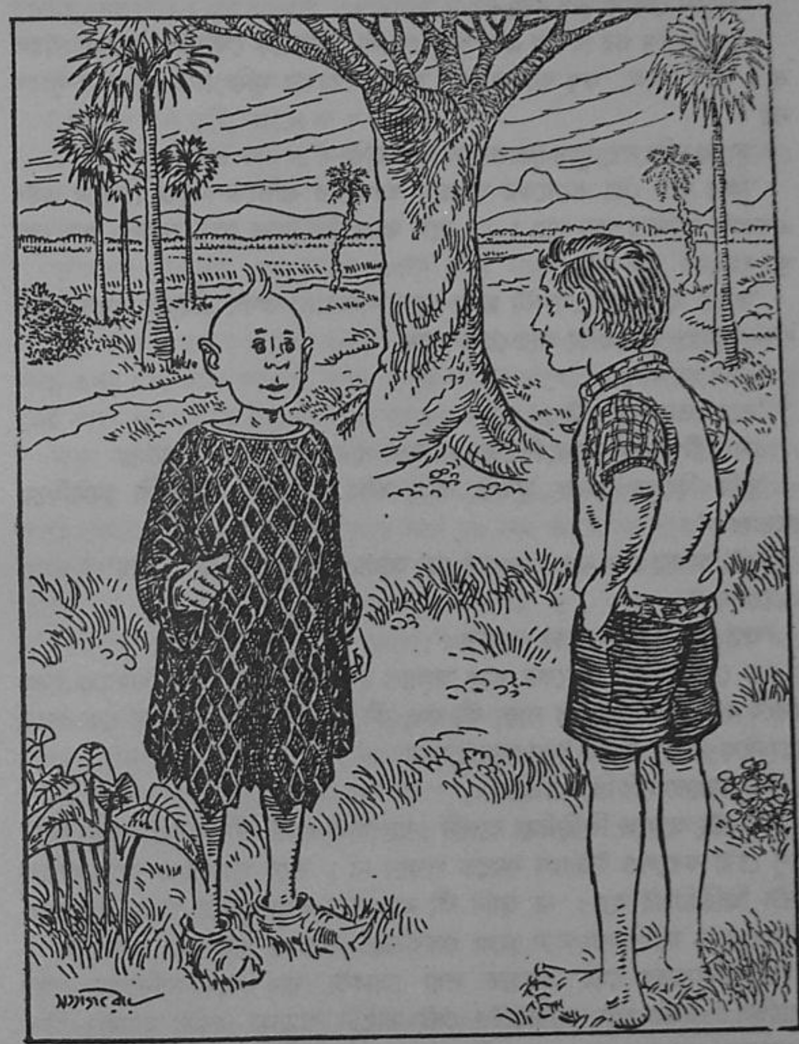

'আর নাম শ্রীমান তর্পণ চৌধুরী ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কোনো ভুল নেই।'

লোকটা যে ওর বিষয়ে এত খবর পেলো কোত্থেকে সেটা টিপু বুঝতে পারল না। টিপু বলল, 'শুধু আমার দুঃখ হলেই তোমার মুক্তি ? আর কারুর দুঃখে নয় ?'

'দুঃখে মুক্তি নয়, দুঃখ দূর করলে তবে মুক্তি।'

'কিন্তু দুঃখ তো অনেকের আছে। আমাদের বাড়িতে নিকুঞ্জ ভিখিরি এসে একতারা বাজিয়ে গান গায়। সে বলে তার তিন কুলে কেউ নেই। তার তো খুব দুঃখ।'

'তাতে হবে না,' লোকটা মাথা নেড়ে বলল। 'তর্পণ চৌধুরী, বয়স সাড়ে দশ—এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ আছে ?'

'বোধ হয় না।'

'তবে তোমাকেই চাই।'

এবার টিপু একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'তুমি কিসের থেকে মুক্তির কথা বলছ ? তুমি তো দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছ।'

'এটা আমার দেশ নয়। এখানে তো আমায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।'

'কেন ?'

'অত জানার কী দরকার তোমার ?'

'বা রে, একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হল, আর তার বিষয় জানতে ইচ্ছা করবে না ? তুমি কোথায় থাক, কী কর, কী নাম তোমার, আর কে কে চেনে তোমাকে—সব জানতে ইচ্ছা করছে আমার।'

'অত জানলে জিঞ্জিরিয়া হবে।'

লোকটা আসলে জিঞ্জিরিয়া বলেনি ; বলেছিল একটা ভীষণ কঠিন কথা যেটা টিপু চেষ্টা করলেও উচ্চারণ করতে পারবে না। তবে খুব সহজ করে বললে সেটা জিঞ্জিরিয়াই হয়। না জানি কী ব্যারামের কথা বলছে, তাই টিপু আর ঘাঁটাল না। কার কথা মনে হচ্ছে লোকটাকে দেখে ? রামখেল তিলক সিং ? নাকি ঘ্যাঁঘাসুরের সেই একহাত লম্বা লোকটা, যার সঙ্গে মানিকের দেখা হয়েছিল ? নাকি স্নো হোয়াইটের সেই সাতটা বামনের একটা বামন ? টিপু রূপকথার পোকা। তার দাদু প্রতিবারই পুজোয় কলকাতা থেকে আসার সময় তার জন্য তিন-চারখানা করে রূপকথার বই এনে দেন। 'টিপুর মনটা সে সব পড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ছত্রিশ পাহাড় পেরিয়ে

কোথায় যেন উড়ে চলে যায়। সে নিজেই হয়ে যায় রাজপুত্তুর—তার মাথায় মুক্তো বসানো পাগড়ি আর কোমরে হীরে বসানো তলোয়ার। কোনোদিন চলেছে গজমোতির হার আনতে, কোনোদিন ড্র্যাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

'গুড বাই।'

সে কী, লোকটা যে চলল !

'কোথায় থাক তুমি, বললে না ?'

লোকটা তার প্রশ্নে কান না দিয়ে শুধু বলল, 'তোমার দুঃখ হলে তখন আবার দেখা হবে।'

'কিন্তু তোমায় খবর দেব কী করে ?'

ততক্ষণে লোকটা এক লাফে একটা দেড় মানুষ উঁচু কুল গাছ টপ্‌কে হাইজাম্পে ওয়ার্লড রেকর্ড করে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এটা প্রায় দেড়মাস আগের ঘটনা। তারপর থেকে লোকটা আর আসেনি। কিন্তু এখন তো আসা দরকার, কারণ টিপুর সত্যিই দুঃখের কারণ হয়েছে। আর সেই কারণ হল তাদের ইস্কুলের নতুন অঙ্কের মাস্টার নরহরিবাবু।

নতুন মাস্টারমশাইকে টিপুর এমনিতেই ভালো লাগেনি। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে কিছু বলার আগে প্রায় দুমিনিট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সারা ক্লাসের ছাত্রদের উপর যেভাবে চোখ বোলালেন তাতে মনে হয় যেন আগে সকলকে ভস্ম করে তারপর পড়াতে শুরু করবেন। তাল গাছের হুসুর মুসুরের মতো এমন ঝাঁটা গোঁফ যে সত্যি-মানুষের হয় সেটা টিপু জানতই না। তার ওপর ওরকম মুখে-হাঁড়িধরা গলার আওয়াজ। ক্লাসের কেউই তো কালা নয়, তাহলে অত হুমকিয়ে কথা বলার দরকারটা কী ?

আসল গোলমালটা হল দুদিন পরে, বিষ্যুদবারে। দিনটা ছিল মেঘলা, তার উপর পৌষ মাসের শীত। টিফিনের সময় টিপু ক্লাস থেকে না বেরিয়ে নিজের ডেস্কে বসে পড়ছিল ডালিমকুমারের গল্প। কে জানত ঠিক সেই সময়ই অঙ্কের স্যার ক্লাসের পাশ দিয়ে যাবেন, আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্লাসে ঢুকে আসবেন ?

'ওটা কী বই, তর্পণ ?'

স্যারের স্মরণশক্তি যে সাংঘাতিক সেটা বলতেই হবে, কারণ দুদিনেই সব ছাত্রদের নাম মুখস্ত হয়ে গেছে।

টিপুর বুকটা দুরদুর করলেও, টিফিনে গল্পের বই পড়াটা দোষের নয় মনে করে সে বলল, 'ঠাকুরমার ঝুলি, স্যার।'

'কই দেখি।'

টিপু বইটা দিয়ে দিল স্যারের হাতে। স্যার মিনিটখানেক ধরে সেটা

উলটেপালটে দেখে বললেন, 'হাঁউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ, হীরের গাছে মোতির পাখি, শামুকের পেটে রাজপুত্তুর—এসব কী পড়া হচ্ছে শুনি ? যত আজগুবি ধাপ্পাবাজি ! এসব পড়লে অঙ্ক মাথায় ঢুকবে কেমন করে, অ্যাঁ ?'

'এ তো গপ্প, স্যার,' টিপু কোনোরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে বলল।

'গপ্প ? গপ্পর তো একটা মাথামুণ্ডু থাকবে, নাকি যেমন তেমন একটা লিখলেই হল ?'

টিপু অত সহজে হার মানতে চাইছিল না। বলল, 'রামায়ণেও তো আছে হনুমান জাম্বুবান, আর মহাভারতে বক রাক্ষস আর হিড়িম্বা রাক্ষসী আর আরো কত কী।'

'জ্যাঠামো কোরো না,' দাঁত খিঁচিয়ে বললেন নরহরি স্যার। 'ওসব হল মুনি-ঋষিদের লেখা, দুহাজার বছর আগে। সে তো গণেশ ঠাকুরেরও—মানুষের গায়ে হাতির মাথা, আর মা দুর্গার দশটা হাত। ও জিনিস আর তোমার এ মনগড়া গাঁজাখুরি গপ্প এক জিনিস নয়। তোমরা এখন পড়বে মনীষীদের জীবনী, ভালো ভালো ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের কথা, মানুষ কী করে ছোট থেকে বড় হয়েছে সেই সব কথা। তোমাদের বয়সে বাস্তব কথার দাম হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তোমরা হলে বিংশ শতাব্দীর ছেলে। আদ্যিকালের পল্লীগ্রামে যে জিনিস চলত সে জিনিস আজ শহরে চলবে কী করে ? এসব পড়তে হলে পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় গিয়ে বসতে হবে, আর দুলে দুলে কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্ত করতে হবে। সে সব পারবে তুমি ?'

টিপু চুপ করে রইল। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা শুনতে হবে সেটা ভাবতে পারেনি।

'ক্লাসে আর কে কে এসব বই পড়ে ?' অঙ্ক স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

সত্যি বলতে কি, আর কেউই প্রায় পড়ে না। শীতল একবার টিপুর কাছ থেকে হিন্দুস্থানী উপকথা ধার নিয়ে গিয়েছিল, পরদিনই ফেরত দিয়ে বলল, 'ধুস্, এর চেয়ে অরণ্যদেব ঢের ভালো।'

'আর কেউ পড়ে না স্যার,' বলল টিপু।

'হুঁ।...তোমার বাবার নাম কী ?'

'তারানাথ চৌধুরী।'

'কোথায় থাক তোমরা ?'

'স্টেশন রোড। পাঁচ নম্বর।'

'হুঁ।'

বইটা ঠক্ করে ডেস্কের উপর ফেলে দিয়ে অঙ্ক স্যার চলে গেলেন।

ইস্কুলের পর টিপু সোজা বাড়ি ফিরল না। ইস্কুলের পুব দিকে ঘোষেদের আম

বাগানটা ছাড়িয়ে বিষ্ণুরাম দাসের বাড়ির বাইরে বাঁধা সাদা ঘোড়াটার দিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল জামরুল গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুরামবাবুর বিড়ির কারখানা আছে। ঘোড়ায় চড়ে কারখানায় যান। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু এখনো মজবুত শরীর।

টিপু প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দেখে, কিন্তু আজ আর কিছু ভালো লাগছিল না। তার মন বলছে অঙ্ক স্যার তার গল্পের বই পড়া বন্ধ করার মতলব করছেন। গল্পের বই না পড়ে সে থাকবে কী করে ? সারা বছরের একটা দিনও তার গল্পের বই পড়া বন্ধ থাকে না, আর সবচেয়ে ভালো লাগে ওইসব বইগুলো, যেগুলোকে অঙ্ক স্যার বললেন আজগুবি আর গাঁজাখুরি। কই, ও তো এসব বই পড়েও অঙ্কেতে কোনোদিন খারাপ করেনি। গত পরীক্ষায় পঞ্চাশে চুয়াল্লিশ পেয়েছিল। আর আগের অঙ্কের স্যার ভূদেববাবুর কাছে তো অঙ্কের জন্য কোনোদিন ধমক খেতে হয়নি !

শীতকালের দিন ছোট বলে এমনিতেই টিপু এবার বাড়ি ফিরবে ভাবছিল, এমন সময় একটা ব্যাপার দেখে ঝট্ করে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হল।

অঙ্ক স্যার নরহরিবাবু বই ছাতা বগলে এদিকেই আসছেন।

তাহলে কি ওঁর বাড়ি এই দিকেই ? বিষ্ণুরামবাবুর বাড়ির পরে আরো গোটা পাঁচেক বাড়ি আছে অবিশ্যি এ রাস্তায়। তারপরেই হামলাটুনির মাঠ। ওই মাঠের পুব দিকে এককালে রেশমের কুঠি ছিল। হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন তার ম্যানেজার। ভয়ংকর কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। বত্রিশ বছর ম্যানেজারি করে কুঠির পাশেই তাঁর বাংলোতে মারা যান। তাঁর নামেই ওই মাঠের নাম হয়ে গেছে হামলাটুনির মাঠ।

আলো পড়ে আসা পৌষ মাসের বিকেলে জামরুল গাছের আড়াল থেকে ও দেখছে নরহরি স্যারকে। ভারী অবাক লাগছে তাঁর হাবভাব দেখে। স্যার এখন বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ছুঁচোল করে চুক্ চুক্ শব্দ করে ঘোড়ার কাঁধে হাত বুলোচ্ছেন।

এমন সময় খুট করে বাড়ির সদর দরজা খোলার শব্দ হল, আর বিষ্ণুরামবাবু নিজেই চুরুট হাতে করে বেরিয়ে এলেন।

'নমস্কার।'

ঘোড়ার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে অঙ্ক স্যার বিষ্ণুরামবাবুর দিকে ফিরলেন। বিষ্ণুরামবাবুও নমস্কার করে বললেন, 'এক হাত হবে নাকি ?'

'সেই জন্যেই তো আসা,' বললেন অঙ্ক স্যার। তার মানে অঙ্ক স্যার দাবা খেলেন। বিষ্ণুরামবাবু যে খেলেন সেটা টিপু জানে। অঙ্ক স্যার এবার বললেন, 'দিব্যি ঘোড়াটি আপনার। পেলেন কোত্থেকে ?'

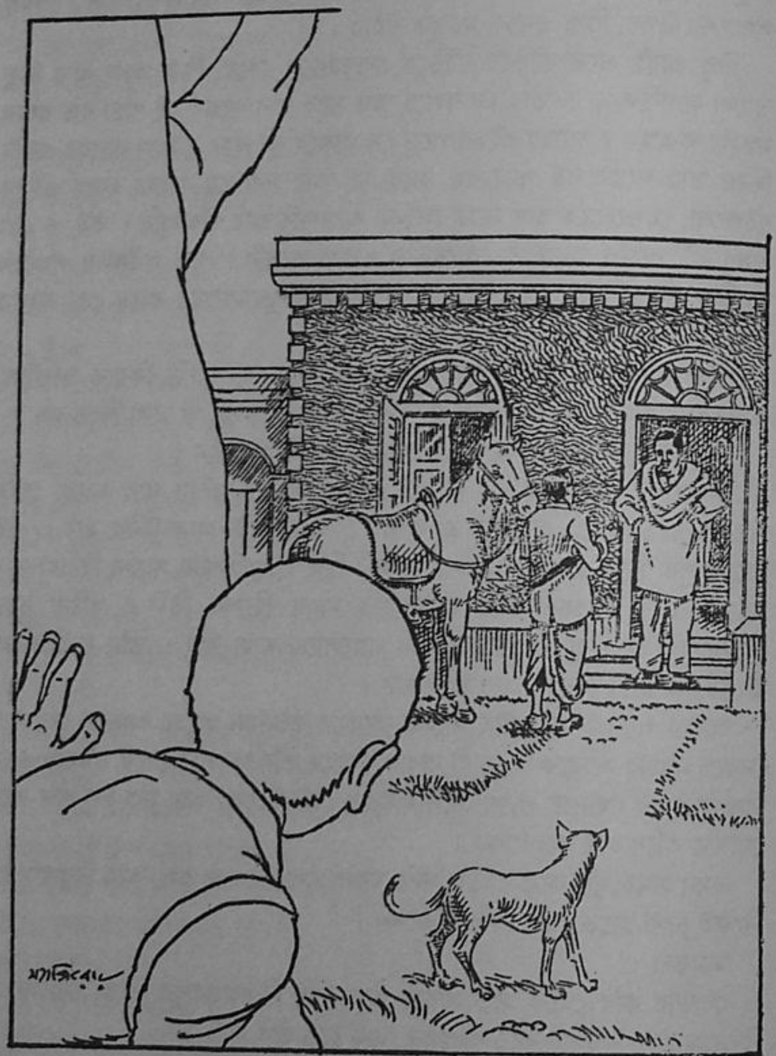

'কলকাতা। শোভাবাজারের দ্বারিক মিত্তিরের ছিল ঘোড়াটা। ওনার কাছ থেকেই কেনা। রেসের মাঠে ছুটেছে এককালে। নাম ছিল পেগ্যাসাস।'

পেগ্যাসাস ? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হল টিপুর, কিন্তু কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না।

'পেগ্যাসাস,' বললেন অঙ্ক স্যার। 'কিম্ভূত নাম তো মশাই।'

'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ওই রকমই নাম হয়। হ্যাপি বার্থডে, শোভান আল্লা, ফরগেট-মি-নট...'

'আপনি চড়েন এ ঘোড়া ?'

'চড়ি বৈকি। তালেবর ঘোড়া। একটি দিনের জন্যেও বিগড়োয়নি।'

অঙ্ক স্যার চেয়ে আছেন ঘোড়াটার দিকে। বললেন, 'আমি এককালে খুব চড়েছি ঘোড়া।'

'বটে ?'

'তখন আমরা শেরপুরে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে যেতেন। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। সুযোগ পেলেই চড়তুম। ওঃ, সে কি আজকের কথা !'

'চড়ে দেখবেন এটা ?'

'চড়ব ?'

'চড়ুন না।'

টিপু অবাক হয়ে দেখল অঙ্ক স্যার হাত থেকে বই ছাতা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে ঘোড়ার দড়িটা খুলে এক ঝটকায় সেটার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পাশে দুবার চাপ দিতেই সেটা খট্ খট্ করে চলতে আরম্ভ করল।

'দেখবেন, বেশিদূর যাবেন না,' বললেন বিষ্ণুরামবাবু।

'আপনি ঘুঁটি সাজান গিয়ে,' বললেন অঙ্ক স্যার, 'আমি খানিকদূর গিয়েই ঘুরে আসছি।'

টিপু আর থামল না। আজ একটা দিন গেল বটে !

কিন্তু ঘটনার শেষ এখানেই নয়।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। টিপু পরের দিনের পড়া শেষ করে সবে ভাবছে এবার গল্পের বইটা খুলবে কিনা, এমন সময় বাবা ডাক দিলেন নীচ থেকে।

টিপু নীচে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখে নরহরি স্যার বসে আছেন বাবার সঙ্গে। টিপুর রক্ত হিম হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'তোমার দাদুর দেওয়া যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো ইনি একবার চাইছেন। যাও তো নিয়ে এসো গিয়ে।'

টিপু নিয়ে এল। সাতাশখানা বই। তিন খেপে আনতে হল।

অঙ্ক স্যার ঝাড়া দশ মিনিট ধরে বইগুলো দেখলেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন আর হুঁঃ করে একটা শব্দ করেন। তারপর বইগুলো রেখে দিয়ে বললেন—

'দেখুন মিস্টার চৌধুরী, আমি যেটা বলছি সেটা আমার অনেক দিনের চিন্তা-গবেষণার ফল। ফেয়ারি টেইল বলুন আর রূপকথাই বলুন আর উপকথাই বলুন, এর ফল হচ্ছে একই—ছেলেমেয়েদের মনে কুসংস্কারের বীজ বপন করা। শিশুমনকে যা বোঝাবেন তাই তারা বুঝবে। সেখানে আমাদের বড়দের দায়িত্বটা কতখানি সেটা একবার ভেবে দেখুন! আমরা কি তাদের বোঝাব, বোয়াল মাছের পেটে থাকে মানুষের প্রাণ? যেখানে আসল কথাটা হচ্ছে যে প্রাণ থাকে মানুষের হৃৎপিণ্ডে—তার বাইরে কোথাও থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়।'

বাবা পুরোপুরি কথাটা মানছেন কিনা সেটা টিপু বুঝতে না পারলেও, এটা সে জানে যে ইস্কুলের মাস্টারদের কথা যে মেনে চলতে হয়, এটা তিনি বিশ্বাস করেন। 'ছেলে বয়সটা মেনে চলারই বয়স, টিপু,' এ কথা বাবা অনেকবার বলেছেন। 'বিশেষ করে গুরুজনদের কথা মানতেই হবে। নিজের ইচ্ছে মতো সব কিছু করার বয়সও আছে একটা, কিন্তু সেটা পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর। তখন তোমাকে কেউ বলবে না এটা কর, ওটা কর। বা বললেও, সেখানে তোমার নিজের মতটা দেবার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা এখন নয়।'

'আপনার বাড়িতে অন্য ধরনের শিশুপাঠ্য বই নেই?' জিজ্ঞেস করলেন নরহরি স্যার।

'আছে বৈকি,' বললেন বাবা। 'আমার বুক শেল্‌ফেই আছে। আমার ইস্কুলে প্রাইজ পাওয়া বই। টিপু, তুই দেখিস্‌নি?'

'সব পড়া হয়ে গেছে বাবা,' বলল টিপু।

'সবগুলো?'

'সবগুলো। বিদ্যাসাগরের জীবনী, সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী, ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযান, মাঙ্গো পার্কের আফ্রিকা ভ্রমণ, ইস্পাতের কথা, আকাশযানের কথা...। প্রাইজ আর কটাই বা পেয়েছ বাবা?'

'তা বেশ তো,' বললেন বাবা। 'নতুন বই এনে দেওয়া যাবেখন।'

'আপনি এখানে তীর্থঙ্কর বুক স্টলে বললে ওরা কলকাতা থেকে আনিয়ে দেবে বই,' বললেন অঙ্ক স্যার, 'সেই সবই তুমি পড়বে এবার থেকে, তর্পণ। এগুলো বন্ধ।'

এগুলো বন্ধ। ওই দুটো কথায় যেন এক মুহূর্তে পৃথিবীটা টিপুর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। এগুলো বন্ধ!

আর বন্ধ যাতে হয় তার জন্য বাবাও অঙ্ক স্যারের থেকে নিয়ে বইগুলো তাঁর আলমারির তাকে ভরে ফেলে চাবি বন্ধ করে দিলেন।

মা অবিশ্যি ব্যাপারটা শুনে বেশ খানিকক্ষণ গজর গজর করেছিলেন। খাবার সময় একবার তো বলে ফেললেন, 'যে লোক এমন কথা বলতে পারে তাকে মাস্টার করে রাখা কেন বাপু?'

বাবা পরপর তিনবার উহুঁ বলে মা-কে থামিয়ে দিলেন।—'তুমি বুঝছ না। উনি যা বলছেন টিপুর ভালোর জন্যই বলছেন।'

'ছাই বলছেন।' তারপর টিপুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুই ভাবিস্‌নে রে। আমি বলব তোকে গল্প। তোর দিদিমার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি ছেলেবেলায়। সব তো আর ভুলিনি।'

টিপু কিছু বলল না। মুশকিল হচ্ছে কি, মা-র কাছে টিপু এককালে অনেক গল্পই শুনেছে। তার বাইরে মা আর কিছু জানেন বলে মনে হয় না। আর জানলেও, বই পড়ার মজা মুখে শোনা গল্পে নেই। বইয়ে ডুবে যাওয়া একটা আলাদা ব্যাপার। সেখানে শুধু গল্প আর তুমি—মাঝখানে কেউ নেই। সেটা মা-কে বোঝাবে কী করে?

আরো দুদিন গেল টিপুর বুঝতে যে এবার সত্যি সত্যিই সে দুঃখ পাচ্ছে। গোলাপীবাবু যে দুঃখের কথা বলেছিলেন, এটা সেই দুঃখ। এবার এক উনিই যদি কিছু করতে পারেন।

আজ রবিবার। বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকে সেলাই-এর কল চালাচ্ছেন। এখন বেজেছে সাড়ে তিনটে। এখন একবার পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। লোকটা যে কেন বলে গেল না সে কোথায় থাকে! সে না এলে টিপু সটান তার বাড়িতে চলে যেতে পারত।

টিপু পা টিপে টিপে একতলায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু তাও বেশ শীত শীত ভাব। দূরে ধান ক্ষেতে সোনালী রং ধরে আছে পাহাড়ের লাইন অবধি। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে একটানা, আর চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দটা নিশ্চয়ই ওই শিরীষ গাছের বাসিন্দা কোনো একটা কাঠবেড়ালী করছে।

'হ্যালো।'

আরে! কী আশ্চর্য! কখন যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায় সেটা টিপু দেখতেই পায়নি।

'তোমার কানের পিছনে নীল রঙ, হাতের তেলো খস্‌খসে, বুঝতেই পারছি তোমার দুঃখের কারণ ঘটেছে।'

'তা ঘটেছে বৈকি।'

লোকটা এগিয়ে আসছে টিপুর দিকে। আবার সেই পোশাক। আবার মাথার চুলগুলো ফৎফৎ করে ঝুঁটির মতো উড়ছে বাতাসে।

'কী ঘটেছে সেটা বলতে হবে তো, নইলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'

টিপুর হাসি পেলেও, লোকটাকে শুধরোবার চেষ্টা না করে অঙ্ক স্যারের পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে ফেলল। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেলেও মনের জোরে নিজেকে সামলে নিল টিপু।

'হুঁ' বলে লোকটা ষোলবার ধীরে ধীরে মাথা উপর-নীচ করল। টিপু ভেবেছিল আর থামবেই না ; আর সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল যে লোকটা হয়তো কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। যদি না পায় তাহলে যে কী দশা হবে সেটা ভেবে টিপুর আবার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটা মাথা নাড়া থামিয়ে আবার 'হুঁ' বলাতে টিপুর ধড়ে প্রাণ এল।

'তুমি কিছু করতে পারবে কি?' টিপু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ভেবে দেখতে হবে। পাকস্থলীটা খাটাতে হবে।'

'পাকস্থলী? কেন, তোমরা মাথা খাটাও না বুঝি?'

লোকটা কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমার এই নরহরি স্যারকে কাল দেখলাম না মাঠে ঘোড়া চড়তে?'

'কোন্ মাঠে? হামলাটুনির মাঠে?'

'যে মাঠে ভাঙা বাড়িটা আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি সেইখানেই থাক?'

'ওই ভাঙা বাড়িটার পিছনেই আমার ট্রিডিঙ্গিপিডিটা রয়েছে।'

টিপু কথাটা ঠিক করে শোনেনি নিশ্চয়ই। তবে শুনলেও সেটা যে তার জিভ দিয়ে কিছুতেই বেরোত না সেটা সে জানে।

লোকটা এখনো আছে, আর আবার মাথাটা উপর-নীচ করতে আরম্ভ করেছে।

এবার একত্রিশবার নাড়াবার পর মাথা থামিয়ে লোকটা বলল, 'আজ ফুল্ মুন্। তুমি যদি ব্যাপারটা দেখতে চাও, তাহলে চাঁদ যখন মাঠের মাঝখানের খেজুর গাছটার ঠিক মাথায় আসবে তখন মাঠে এসে যেও। আড়ালে থেকো ; কেউ যেন দেখে না ফেলে। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।'

টিপুর হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল।

'তুমি অঙ্ক স্যারকে মেরে-টেরে ফেলবে না তো?'

এই প্রথম লোকটাকে হো হো করে হাসতে দেখল টিপু, আর সেই সঙ্গে দেখল লোকটার মুখের ভিতর একটার উপর আরেকটা জিভ। আর দেখল যে

লোকটার দাঁত বলে কিচ্ছু নেই।

'মেরে ফেলব?'—লোকটা কোনোরকমে হাসি থামাল।—'উহুঁ। আমরা কাউকে মারি-টারি না। একজনকে চিমটি কাটার কথা ভেবেছিলাম বলেই তো আমার নির্বাসন। প্রথম ছক কেটে বেরোল পৃথিবীর নাম, সেখানে হবে নির্বাসন ; তারপর ছক কেটে বেরোল এই শহরের নাম ; তারপর তোমার নাম। তোমার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েই আমার মুক্তি।'

'ঠিক আছে, তাহলে—'

লোকটা সেদিনের মতোই টিপুর কথা শেষ হবার আগেই কুল গাছের উপর দিয়ে হাই জাম্প করে হাওয়া।

টিপুর শরীরের ভিতর সেই যে মিহি কাঁপুনি শুরু হল সেটা রইল রাত অবধি। আশ্চর্য কপাল,—আজ মা বাবা দুজনেই রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে যাবেন সুশীলবাবুদের বাড়ি। সুশীলবাবুর নাতির মুখে ভাত। টিপুরও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু সামনেই পরীক্ষা, তাই মা নিজেই বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে বসে পড়াশুনা কর।'

সাড়ে সাতটায় মা-বাবা বেরিয়ে গেলেন। টিপু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে পুব দিকটা হলদে হতে শুরু করেছে দেখে বেরিয়ে পড়ল।

ইস্কুলের পিছনের শর্টকাটটা দিয়ে বিষ্ণুরামবাবুদের বাড়ি পৌঁছতে লাগল মিনিট দশেক। ঘোড়াটা নেই। টিপুর ধারণা ওটা বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলে থাকে। সামনের বৈঠকখানার জানালা দিয়ে আলো রাস্তায় এসে পড়েছে, ঘরের ভিতর চুরুটের ধোঁয়া।

'কিস্তি।'

অঙ্ক স্যারের গলা। দাবা খেলছেন বিষ্ণুরামবাবুর সঙ্গে। তাহলে কি আজ ঘোড়া চড়বেন না? সেটা জানার কোনো উপায় নেই। লোকটা কিন্তু বলেছে হামলাটুনির মাঠে যেতে। টিপু যা থাকে কপালে করে সেই দিকেই রওনা দিল।

ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ। এখনো সোনালী, রূপোলী হবে আরো পরে। নেড়া খেজুর গাছটার মাথায় পৌঁছতে এখনো মিনিট দশেক দেরি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না যাকে বলে সেটা হতে আরো সময় লাগবে, তবে একটা ফিকে আলো চারদিক ছেয়ে আছে। তাতে গাছপালা ঝোপঝাড় সবই বোঝা যাচ্ছে। ওই যে দূরে ভাঙা কুঠিবাড়ি। ওর পিছনে কোথায় থাকে লোকটা?

টিপু একটা ঝোপের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য তৈরি হল। তার প্যান্টের পকেটে খবরের কাগজে মোড়া এক টুকরো পাটালি গুড়। টিপু তার

খানিকটা মুখে পুরে চিবোতে লাগল। শেয়াল ডাকছে দূরের বন থেকে। আকাশ দিয়ে যে কালো জিনিসটা উড়ে গেল সেটা নিশ্চয়ই পেঁচা। গরম কোটের উপর একটা খয়েরি চাদর জড়িয়ে নিয়েছে টিপু। তাতে গা ঢাকা দেওয়ারও সুবিধে হবে, শীতটাও বাগে আসবে।

আটটা বাজার যে শব্দটা এলো দূর থেকে সেটা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরামবাবুদের ঘড়ির শব্দ।

আর তার পরেই টিপু শুনতে পেল—খট্‌মট্‌-খট্‌মট্‌-খট্‌মট্‌-খট্‌মট্‌...

ঘোড়া আসছে।

টিপু ঝোপের পাশ দিয়ে মাথাটা বার করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোড়ের দিকে।

হ্যাঁ, ঘোড়া তো বটেই, আর তার পিঠে নরহরি স্যার।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। একটা মশা কিছুক্ষণ থেকেই টিপুর কানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, টিপু হাত চালিয়ে সেটাকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা সুড়ুৎ করে ঢুকল গিয়ে তার নাকের ভিতর।

দু আঙুল দিয়ে নাক টিপে যে হাঁচি চাপা যায় সেটা টিপু আগে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু এখন নাক টিপলে মশাটা আর বেরোবে না মনে করে সে হাঁচিটা আসতে দিল, আর তার শব্দটা খোলা মাঠের শীতের রাতের থমথমে ভাবটাকে একেবারে খান্‌খান্ করে দিল।

ঘোড়া থেমে গেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল টিপুর উপর।

'তর্পণ!'

টিপুর হাত পা অবশ হয়ে গেছে। সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ছি ছি ছি! এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ভেস্তে দেওয়াতে লোকটা না জানি কী মনে করছে!

ঘোড়াটা এগিয়ে আসছিল তারই দিকে, পিঠে অঙ্ক স্যার, কিন্তু এমন সময় স্যারকে প্রায় পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে একটা আকাশচেরা চিঁহিহি ডাক ছেড়ে এক লাফে রাস্তা থেকে মাঠে গিয়ে পড়ল।

আর তার পরেই টিপুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, দেখে যে ঘোড়া আর মাটিতে নেই।

ঘোড়ার দুদিকে দুটো ডানা। সেই ডানায় ঢেউ তুলে ঘোড়া আকাশে উড়তে লেগেছে, অঙ্ক স্যার উপুড় হয়ে ঘোড়ার পিঠ জাপটে ধরে আছেন, তাঁর জ্বলন্ত টর্চ হাত থেকে পড়ে গেছে রাস্তায়। চাঁদ এখন খেজুর গাছের মাথায়, জ্যোৎস্না এখন ফুটফুটে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে অঙ্ক স্যারকে পিঠে নিয়ে বিষ্ণুরাম দাসের ঘোড়া আকাশভরা তারার দিকে উড়তে উড়তে ক্রমেই ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে।

পেগ্যাসাস!

ধাঁ করে টিপুর মনে পড়ে গেল।

গ্রীসের উপকথা। রাক্ষসী মেডুসা—তার মাথায় চুলের বদলে হাজার বিষাক্ত সাপ, তাকে দেখলে মানুষ পাথর হয়ে যায়—তরোয়াল দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল বীর পারসিয়ুস, আর মেডুসার রক্ত থেকে জন্ম নিল পক্ষিরাজ পেগ্যাসাস।

'তুমি বাড়ি যাও, তর্পণ।'

পাশে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত লোকটা, চাঁদের আলো তার মাথার সোনালী ঝুঁটিতে। —'এভরিথিং ইজ অল রাইট।'

তিনদিন হাসপাতালে ছিলেন অঙ্ক স্যার। শরীরে কোনো জখম নেই, খালি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না।

চারদিনের দিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অঙ্ক স্যার টিপুদের বাড়িতে এলেন। বাবার সঙ্গে কী কথা হল সেটা টিপু জানে না। অঙ্ক স্যার চলে যাবার পরেই বাবা টিপুকে ডাকলেন।

'ইয়ে, তোর বইগুলো নিয়ে যা আমার আলমারি থেকে। উনি বললেন ওসব গল্পে ওঁর আপত্তি নেই।'

সেই লোকটাকে আর দেখেনি টিপু। তার খোঁজে একদিন গিয়েছিল কুঠিবাড়ির পিছনটায়। পথে যেতে দেখেছে বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়া যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির পিছনে কিচ্ছু নেই।

শুধু একটা গিরগিটি দেখতে পেয়েছিল টিপু, যেটার রং একদম গোলাপী।

গগন চৌধুরীর স্টুডিও

একটা ফ্ল্যাট দিনের বেলা দেখে পছন্দ হলেও, সেখানে গিয়ে থাকা না অবধি তার সুবিধে-অসুবিধেগুলো ঠিক বোঝা যায় না। সুধীন সরকার এইটেই উপলব্ধি করল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটে বসবাস আরম্ভ করে। এই একটা ব্যাপারেই ভাগ্যলক্ষ্মী একটু শুকনো হাসলেন ; না হলে তিনি যে সুধীনের প্রতি সবিশেষ প্রসন্না তার নজিরের অভাব নেই।

যেমন তার পদোন্নতির ব্যাপারটাই ধরা যাক। সে এখন আপিসের একটি ডিপার্টমেন্টের হেড। ঠিক এত তাড়াতাড়ি মাথায় পৌঁছানোর কথা নয় ; হাজার হোক তার বয়সটা তো বেশি নয়—এই আষাঢ়ে একত্রিশে পড়েছে সে। ডিপার্টমেন্টের কাঁধ অবধি এমনিতেই উঠেছিল সুধীন। মাথায় ছিল নগেন্দ্র কাপুর, যাঁর বয়স চল্লিশ, যিনি দীর্ঘাঙ্গী, সুপুরুষ, কর্মক্ষম ; যিনি ছাই রঙের সাফারি সুট পরে আপিসে ঢুকলে সকলের দৃষ্টি চলে যায় তাঁর দিকে। সেই নগেন্দ্র কাপুর যে অকস্মাৎ টালিগঞ্জের গলফের মাঠে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবেন সে কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল ? এই মৃত্যুর পরেই সুধীন দেখল প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে কাপুরের জায়গা অধিকার করে বসেছে। এটা অবিশ্যি শুধু কপালজোরে নয় ; সুধীন এই পদের উপযুক্ত নয় এ অপবাদ তাকে কেউ দেবে না।

তারপর এই ফ্ল্যাট। সুধীনের বাপ মা তাকে সংসারী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, সময়টাও ভালো, কাজেই সুধীনকে বাধ্য হয়েই সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। আগে পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটটা ছিল, তার পায়রার খোপের মতো দুখানা ঘরে সংসার করা চলে না। তাছাড়া কাছেই ছিল একটা বিয়ে-সাদিতে ভাড়া দেওয়ার বাড়ি। অষ্টপ্রহর গ্রামোফোন রেকর্ডে সানাইয়ের বিকৃত বাঁশফাটা সুরে সুধীনের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। দালালের কাছ

থেকে খবর পেয়ে সুধীন প্রথম যে ফ্ল্যাটটা দেখতে গেল সেটাই হল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাট। দোতলার ফ্ল্যাট, তিনখানা বেশ বড় বড় ঘর, দুটো বাথরুম, দক্ষিণে বারান্দা, মেঝের মোজেইক, জানালার গ্রিল, ফ্ল্যাটের প্ল্যান—সব কিছুতেই সুপরিকল্পনা ও সুরুচির ছাপ। ভাড়া আটশো। সর্বোপরি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মোটামুটি সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়। সুধীনের আর দ্বিতীয় কোনো ফ্ল্যাট দেখতে হয়নি।

দু সপ্তাহ হল সে এসেছে এই ফ্ল্যাটে। প্রথম কদিন অত খেয়াল করেনি, তারপর একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখল তার চোখে বাইরে থেকে বিজলী আলো এসে পড়েছে। বেশ উজ্জ্বল আলো। এত রাত্রে আলো আসে কোত্থেকে ?

সুধীন বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সারা পাড়া অন্ধকার, কেবল একটি আলো জ্বলছে রাস্তার উল্টো দিকের প্রাচীন অট্টালিকার তিনতলার একটি ঘরে। খোলা জানালার পর্দার উপর দিয়ে সটান এসে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেছে সুধীনের ঘরে। শুধু ঘরে নয়, একেবারে সুধীনের বিছানায়। বালিশ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে শুলেও সে আলো পড়বে সুধীনের মুখে।

এ তো বড় জ্বালাতন ! ঘর অন্ধকার না হলে মানুষ ঘুমোয় কী করে ? অন্তত সুধীন সেটা পারে না। এটা কি রোজই হবে নাকি ?

আরো এক সপ্তাহ দেখার পর সুধীন বুঝল এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। বারোটার কিছু আগে থেকেই আলোটা জ্বলে, এবং জ্বলে থাকে ভোর অবধি। অথচ নিজের ঘরের দক্ষিণের জানালা বন্ধ করে শোয়ায় সুধীনের ঘোর আপত্তি। কার না হয় ? কলকাতায় ওই একটি জিনিসের অনেক দাম। দক্ষিণের জানালা। বিশেষ করে তার সামনে যদি অন্য কোনো বাড়ি না থাকে। সেটাও এ ফ্ল্যাটের একটা লোভনীয় দিক। জানালার সামনে রাস্তার ওপরে হল ওই পুরনো বনেদি বাড়িটার সংলগ্ন বাগান, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নতুন দালান ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাড়িটা কোনো এককালীন জমিদারের সেটা বোঝাই যায়। সংস্কার হয়নি বহুদিন, লোকজনও বিশেষ থাকে বলে মনে হয় না।

এক ওই তিনতলার ঘরে ছাড়া।

কোনো অজ্ঞাত কারণে ওই ঘরের বাসিন্দা সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন।

একতলার ফ্ল্যাটে ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সোমেশ্বর নাগ। সুধীনের মাস চারেক আগে ইনি এসেছেন এই ফ্ল্যাটে। বছর পঞ্চান্ন বয়স, বেঙ্গল ক্লাবের মেমবার, সন্ধ্যাটা তিনি ক্লাবেই কাটান। এক শনিবার বিকেলে বাড়ির গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুধীন তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপের লোভ সামলাতে পারল

না।

'আমাদের উল্টোদিকের বাড়িটা কাদের বলুন তো ?'

'চৌধুরী। কেন, কী ব্যাপার ?'

'না, মানে, বাড়িতে তো বিশেষ কেউ থাকে-টাকে বলে মনে হয় না, অথচ তিনতলার একটা ঘরে সারারাত বাতি জ্বলে। সেটা লক্ষ করেছেন ?'

'না, তা তো করিনি।'

'আপনাদের ঘরে আসে না আলো ?'

'সেটা তো সম্ভব নয়। ওদের ছাতের পাঁচিলটা সামনে পড়ে তো। আমরা তো ঘরটাই দেখতে পাই না।'

'খুব বেঁচে গেছেন। আমার তো রাত্রে ঘুমই হয় না ওই আলোর জন্য।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ। শুনেছি তো ওই এতবড় বাড়িতে একটি কি দুটি মাত্র প্রাণী থাকে। মালিক হলেন গগন চৌধুরী। তাঁকে বড় একটা দেখা-টেখা যায় না। আমি তো এসে অবধি দেখিনি। তবে আছেন বলে জানি। বয়স হয়েছে বোধহয়। শুনেছি এককালে ছবি-টবি আঁকতেন। আপনি এক কাজ করুন না। ভদ্রলোককে গিয়ে সোজাসুজি বলুন। অন্তত ওঁর নিজের ঘরের জানালাটা তো বন্ধ করে দিতে পারেন। এতটুকু কনসিডারেশন হবে না প্রতিবেশীর জন্য ?'

এ কাজটা অবিশ্যি করা যায়, যদিও সহজ নয়। অনুরোধ করলেও সেটা যে গ্রাহ্য হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। রাত্রে কী ঘটনা ঘটে ওই গগন চৌধুরীর ঘরে ?

সুধীন বুঝতে পারল, আলোর জন্য ব্যাঘাতের প্রশ্নটা বড় ঠিকই, কিন্তু ওই প্রাচীন অট্টালিকার ওই ঘরে কী ঘটছে সেটা জানার আগ্রহও কম নয়। তার বন্ধু মহিম রেসের মাঠে যাতায়াত করে ; তার একটি বড়ো বাইনোকুলার আছে। সেটা দিয়ে দেখলে কিছু জানা যাবে কি ? বাইনোকুলারের দরকার এই জন্যেই যে ঘরটা নেহাত কাছে নয়। চৌধুরীদের বাড়িটা ঠিক রাস্তার উপরে নয় ; পাঁচিল পেরিয়ে সামনে বেশ খানিকটা জায়গা আছে যেটা বাগানেরই অংশ। এই দূরত্বের পরেও আরও দূরত্ব আছে, কারণ তিনতলার ঘরটা ছাতের খানিকটা অংশ পেরিয়ে।

মহিমের বাইনোকুলারে জানালাটা চলে এল অনেকখানি কাছে, কিন্তু পর্দার উপর দিয়ে দেয়ালের খানিকটা অংশ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা গেল না। দেয়ালে টাঙানো তেল রঙে আঁকা দুটি আবক্ষ প্রতিকৃতির খানিকটা করে অংশ দেখা যাচ্ছে সীলিং-এর ওই আলোতে। তাহলে কি শিল্পীর ঘর ? এটাই কি ছিল ভদ্রলোকের স্টুডিও ? কিন্তু সেখানে কি কোনো মানুষ নেই ?

হ্যাঁ, আছে। এইমাত্র জানালার পর্দায় ছায়া ফেলে একটা মূর্তি ডান থেকে বাঁ

দিকে চলে গেল। কিন্তু ছায়া থেকে মানুষ চেনা গেল না। পর্দায় আলোটা পড়াতে তার স্বচ্ছতাও অনেকটা কমে গেছে।

প্রায় পনের মিনিট দেখার পর সুধীনের ক্লান্তি এল। যেটুকু ঘুমের সম্ভাবনা তাও কি সে নষ্ট করবে এই ছেলেমানুষী করে?

বাইনোকুলারটা টেবিলের উপর রেখে সুধীন শুয়ে পড়ল। সে মনে মনে স্থির করে নিয়েছে কী করা দরকার।

সোজা গিয়ে গগন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁকে বলবে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের জানালাটা বন্ধ রাখতে। এতে কাজ হলে হবে, না হলে সুধীনকে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। গগন চৌধুরী লোকটা কিরকম সেটা জানা থাকলে ভালো হত—প্রতিবেশীর কাছ থেকে অভদ্র অপমানসূচক ব্যবহার হজম করা খুব কঠিন, তা তিনি যতই প্রবীণ হন না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

গেটটা খোলা, এবং দারোয়ান নেই দেখে সুধীনের একটু অবাক লাগল; কিন্তু প্রথম বাধা এত সহজে অতিক্রম করতে পারায় সেই সঙ্গে একটু নিশ্চিন্তও লাগল। সে রাত্রেই যাওয়া স্থির করেছে, কারণ ভদ্রলোক দেখতে চাইলে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারবে আলোটা কীভাবে তার ঘরে পড়ে।

ভবানীপুরের ভদ্রপাড়া শীতকালের রাত এগারোটার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল; চৌধুরীবাড়ির আগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের সব কিছুই জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি ডাইনে ফেলে সুধীন এগিয়ে গেল নোনা ধরা গাড়িবারান্দার দিকে। এখনো তিনতলার ঘরে আলো জ্বলেনি। কপাল ভালো হলে গগন চৌধুরীকে হয়তো নিচেই পাওয়া যেতে পারে।

সদর দরজার কড়া নাড়তে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একটি ভৃত্যস্থানীয় প্রৌঢ় দরজা খুলে প্রশ্ন করল—'কাকে চাই?'

'চৌধুরী মশাই—গগন চৌধুরী—তিনি কি শুয়ে পড়েছেন?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় কি? আমার নাম সুধীন সরকার। আমি থাকি ওই সামনের বাড়িতে। একটা বিশেষ কাজে এসেছি।'

চাকর ভিতরে গিয়ে আবার মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল।

'আপনি আসুন।'

সব ব্যাপারটাই যে সহজে হয়ে যাচ্ছে—এ তো ভারী আশ্চর্য!

ভিতরে ঢুকে ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল সুধীন।

'বসুন।'

জানালা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোফার উপর, তাই সুধীন সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বসল। চাকর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল না কেন? এখন তো পাড়ায় লোডশেডিং নেই।

এবারে ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাতে সুধীনের হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দেখতে দেখতে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সে কি ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে এসে পড়ল নাকি? তাকে ঘিরে কারা চেয়ে রয়েছে তার দিকে?

ঘরের প্রায়ান্ধকারে দৃষ্টি আরেকটু অভ্যস্ত হতে সুধীন বুঝতে পারল যারা চেয়ে রয়েছে তারা মানুষ নয়, মুখোশ। প্রত্যেকটি মুখোশের চোখের চাহনি যেন তারই দিকে ঘোরানো। এসব মুখোশ যে এ দেশের নয় সেটাও বুঝেছে সুধীন। দেখে মনে হয় অধিকাংশই আফ্রিকার, কিছু দক্ষিণ আমেরিকার হতে পারে। সুধীন এককালে ভালো ছবি আঁকত, বাপের আপত্তি না থাকলে হয়তো সেটাকেই সে পেশা করত। হাতের নানারকম কাজ সম্বন্ধে তার এখনো যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

সুধীন মনে মনে নিজের সাহসের তারিফ না করে পারল না। অন্ধকার ঘরে মুখোশ পরিবৃত এই ভৌতিক পরিবেশে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যেত।

ঘরে যে কখন লোক প্রবেশ করেছে তা সুধীন টের পায়নি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন শুনে চমকে পাশ ফিরে সোফায় বসা মানুষটাকে দেখতে পেল।

'এত রাত্রে?'

সুধীন হাত দুটোকে প্রায় যন্ত্রের মতো সামনে তুলে নমস্কার করে কথা বলতে গিয়েও পারল না।

ইনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই—পরনে দোরোখা শালই তার পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু গায়ের রঙে এমন পাংশুটে রক্তহীন ভাব, আর চোখের চাহনিতে এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা সুধীন কখনো দেখেনি। এমন ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে কারুরই মুখ দিয়ে চট করে কথা বেরোবে না।

ভদ্রলোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুধীনের দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় এক মিনিট লাগল সুধীনের নিজেকে সামলে নিতে। তারপর সে মুখ খুলল।

'আমি একটা, মানে, অভিযোগ জানাতে এসেছি—কিছু মনে করবেন না। আপনিই গগন চৌধুরী তো?'

ভদ্রলোক একবার শুধু মাথাটা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। প্রশস্ত ললাটের তিনদিক ঘিরে সিংহের কেশরের মতো আধপাকা চুল থেকে মনে হয় বয়স পঁয়ষট্টির কম না।

সুধীন বলে চলল, 'আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। আমি সামনের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি। আসলে হয়েছে কি, আপনার তিনতলার ঘরের বাতিটা সারা রাত জ্বলে বলে বড্ড অসুবিধা হয়। আলোটা সোজা আমার মুখের উপর এসে পড়ে। যদি আপনার জানালাটা বন্ধ করে রাখতে পারতেন!—নইলে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। সারাদিন আপিস করে রাত্তিরে ঘুমোতে না পারলে...'

ভদ্রলোক এখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুধীনের দিকে। এই ঘরের কি কোনো আলোই জ্বলে না নাকি?

অগত্যা সুধীনই আবার মুখ খুলল। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার।

'আমি যদি জানালা বন্ধ করি তাহলেও আলো আসবে না ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণের জানালা তো, তাই...'

'আপনার জানালা বন্ধ করতে হবে না।'

'আজ্ঞে?'

'আমিই করব।'

হঠাৎ যেন একটা বিরাট ভার নেমে গেল সুধীনের বুক থেকে।

'ওঃ, তাহলে তো কথাই নেই। অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি উঠছেন?'

সুধীন ওঠার উদ্যোগ করছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়েই আবার বসে পড়ল—'রাত হল তো। আর আপনিও নিশ্চয়ই শুতে যাবেন।'

'আমি রাত্রে ঘুমোই না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি সুধীনের দিক থেকে এক চুল নড়েনি।

'লেখাপড়া করেন বুঝি?' সুধীন ধরা গলায় প্রশ্ন করল। এই পরিবেশে গগন চৌধুরীর সান্নিধ্য যে খুব স্বস্তিকর নয় সেটা স্বীকার করতেই হবে।

'না।'

'তবে?'

'ছবি আঁকি।'

সুধীনের মনে পড়ে গেল বাইনোকুলার দিয়ে ঘরের দেয়ালে পেন্টিং দেখে মনে হয়েছিল সেটা চিত্রকরের স্টুডিও হতে পারে। নাগ মশাইও বলেছিলেন ইনি এককালে ছবি আঁকতেন।

'তার মানে ওই ঘরটা আপনার স্টুডিও?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'কিন্তু সে কথা বোধহয় পাড়ার বিশেষ কেউ জানে না?'

গগন চৌধুরী একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

'আপনার সময় আছে?'

'সময়, মানে...'

'তাহলে কতগুলো কথা বলি। অনেক দিনের জমে থাকা কথা। কাউকে বলার সুযোগ হয়নি কখনো।'

সুধীন অনুভব করল ভদ্রলোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।

'বলুন।'

'পাড়ার লোকে জানে না কারণ জানার আগ্রহ নেই। একটা লোক সারাটা জীবন শিল্পচর্চা করে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কারুর কোনো কৌতূহল নেই। এককালে যখন এগজিবিশন করেছি, তখন কেউ কেউ এসে দেখেছে, অল্প বিস্তর সুখ্যাতিও করেছে। কিন্তু যখন হাওয়া বদলাতে শুরু করল, মানুষের যে ছবি রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায় তার কদর আর যখন রইল না, তখন থেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে। নতুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে আমি শিখিনি। মনে মনে দা ভিঞ্চিকে গুরু বলে মেনেছিলাম; এখনও তিনিই আমার গুরু।'

'কিন্তু...আপনি কিসের ছবি আঁকেন?'

'মানুষের।'

'মানুষের?'

'পোর্ট্রেট।'

'মন থেকে?'

'না। সেটা আমি পারি না, শিখিনি। আমার সামনে কেউ এসে না বসলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।'

'এই মাঝরাত্তিরে—?'

'আসে। মডেল আসে। সিটিং দেয়। রোজই আসে।'

সুধীন কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে বসে রইল। এ কেমনতরো কথাবার্তা বলছেন ভদ্রলোক? এ যে পাগলের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে!

'বিশ্বাস হচ্ছে না!' গগন চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এই প্রথম একটা পরিষ্কার হাসির আভাস দেখা গেল। সুধীন কী বলবে বুঝতে পারল না।

'আসুন আমার সঙ্গে।'

সুধীন এ আদেশও অমান্য করতে পারল না। ভদ্রলোকের চোখে এবং কথায় একটা সম্মোহনী শক্তি আছে সেটা মানতেই হবে। তার নিজেরও যে কৌতূহল হচ্ছে না তা নয়। কেমন ছবি আঁকেন ভদ্রলোক? কারা আসে সিটিং দিতে মাঝরাত্তিরে? কীভাবে তাদের জোগাড় করা হয়?

'এক আমার স্টুডিওতে ছাড়া বাড়ির আর কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই,' কেরোসিন ল্যাম্পের আবছা হলদে আলোয় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে

উঠতে বললেন ভদ্রলোক। —'বাকি সব কানেকশন কেটে দিয়েছি।'

আশ্চর্য এই যে, ল্যাণ্ডিং-এ, সিঁড়ির দেয়ালে, বৈঠকখানায়—কোথাও একটিও পেন্টিং নেই। সবই কি তাহলে স্টুডিওতে জড়ো করে রেখেছেন ভদ্রলোক?

তিনতলায় উঠে বাঁয়ে ঘুরেই সামনে একটা দরজা। সেই ঘরে সুধীনকে নিয়ে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়ে বাঁয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভরে গেল।

এটাই যে স্টুডিও সেটা আর বলে দিতে হয় না। আঁকার সব সরঞ্জামই রয়েছে এখানে। ঘরের এক পাশে আলোর ঠিক নিচে ইজেলে একটা সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে। তাতে নতুন ছবি শুরু হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সরঞ্জামের বাইরে যেটা আছে সেটা হল দেয়ালে টাঙানো এবং মেঝেতে ডাঁই করে রাখা পোর্ট্রেট। কমপক্ষে একশো তো হবেই। মেঝেরগুলো এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে না ধরলে বোঝা যাবে না। যেগুলো চোখের সামনে জলজ্যান্ত সে হল দেয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেটগুলো। অধিকাংশই পুরুষের ছবি। সুধীন তার তৈরি চোখে বুঝে নিল সাবেকী ঢং-এ আঁকা পেন্টিংগুলোতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে। এখানেও সুধীনের মনে হল যে সে যেন অনেক জ্যান্ত মানুষের ভিড়ে এসে পড়েছে—এবং সবাই চেয়ে আছে তারই দিকে—কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখে।

কিন্তু এরা সব কারা? দু একটা মুখ চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু—

'কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করলেন গগন চৌধুরী।

'উঁচু দরের কাজ,' স্বীকার করতে বাধ্য হল সুধীন।

'অথচ অয়েল পেন্টিং-এ পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজই লোপ পেয়ে গেছে। সেখানে আমাদের মতো শিল্পীদের কী দশা হয় ভেবে দেখেছেন?'

'কিন্তু এ ঘরে এসে তো মনে হচ্ছে না যে আপনার কাজের অভাব আছে।'

'কী বলছেন! সে তো এখন! এককালে পনের বছর ধরে সমানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছি—একটি লোকও সাড়া দেয়নি। শেষটায় বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিই।'

'তারপর? আবার আঁকা শুরু হল কী করে?'

'অবস্থার পরিবর্তনের ফলে।'

সুধীন আর কিছু বলল না, কারণ তার সমস্ত মন এখন ছবির দিকে। ইতিমধ্যে সে তিনজনকে চিনতে পেরেছে। একজন মাস চারেক হল মারা গেছেন। বিখ্যাত গায়ক অনন্তলাল নিয়োগী। সুধীন আসরে বসে তাঁর গান শুনেছে বছর আষ্টেক আগে।

দ্বিতীয়জন হলেন অসীমানন্দ স্বামী—এককালে স্বদেশী করে পরে সন্ন্যাসী

হয়ে যান। ইনিও মারা গেছেন বছরখানেক হল। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল, সুধীনের মনে আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন এয়ার ইণ্ডিয়ার বাঙালী পাইলট ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। লণ্ডন যাবার পথে বোইং দুর্ঘটনায় আড়াইশো যাত্রীসমেত এঁরও মৃত্যু হয় বছর তিনেক আগে। সুধীন যে শুধু ছবি থেকেই চিনল এঁকে তা নয়; একবার আপিসের কাজে রোম যাবার পথে প্লেনের ককপিটে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুধীন একটা প্রশ্ন না করে পারল না।

'এঁরা কি শুধুই পোর্ট্রেট করানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন? সে ছবি নিজেরা নেননি কখনো?'

গগন চৌধুরীকে এই প্রথম গলা ছেড়ে হাসতে শুনল সুধীন।

'না, মিস্টার সরকার, পোর্ট্রেটে এঁদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য আঁকা।'

'আপনি কি বলতে চান রোজই কেউ না কেউ এসে আপনাকে সিটিং দেন?'

'সেটা আর একটুক্ষণ থাকলেই দেখতে পাবেন। আজও লোক আসবে।'

সুধীনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যাচ্ছে।

'কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা কীভাবে—?'

'দাঁড়ান, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সিসটেমটা একটু আলাদা।'

তাক থেকে একটা বেশ বড় খাতা নামিয়ে সুধীনের দিকে নিয়ে এলেন গগন চৌধুরী।

'এটা খুলে দেখুন এতে কী আছে।'

আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে খাতাটা খুলল সুধীন।

খাতার পাতার পর পাতায় আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কাটা মৃত্যুসংবাদ। অনেকগুলো খবরের সঙ্গে ছবিও রয়েছে। সুধীন দেখল যে কিছু কিছু কাটিং-এর পাশে পেনসিল দিয়ে চিকে দেওয়া রয়েছে।

'পেনসিলের দাগ হলে বুঝতে হবে তাদের ছবি আঁকা হয়ে গেছে,' বললেন গগন চৌধুরী।

'কিন্তু যোগাযোগটা করেন কী করে সেটা তো—'

গগন চৌধুরী সুধীনের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে আবার সেটা তাকে রেখে দিলেন। তারপর ঘুরে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওটা সকলে পারে না, আমি পারি। এটা চিঠি বা টেলিফোনের কম্ম নয়। এঁরা যেখানে আছেন সেখানে তো আর টেলিফোন নেই বা ডাক বিলির ব্যবস্থাও নেই। এঁদের জন্য অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।'

সুধীনের হাত পা ঠাণ্ডা, গলা শুকিয়ে কাঠ। তাও একটা প্রশ্ন না করলেই নয়।

'আপনি কি বলতে চান এই সব লোকের পোর্ট্রেট করা হয়েছে এঁদের মৃত্যুর পর?'

'মৃত্যুর আগে এঁদের খবর পাবো কি করে, সুধীনবাবু। আমি আর কলকাতার কটা লোককে চিনি? মৃত্যু না হলে তো তাঁরা আর তাঁদের গণ্ডীর বাইরে বেরোতে পারেন না! একমাত্র মৃত ব্যক্তিই তো সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাঁদের সময়েরও অভাব নেই, ধৈর্যেরও অভাব নেই। ছবি যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণ ঠায় বসে থাকবেন ওই চেয়ারে।'

ঢং-ঢং-ঢং—

রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা ঘড়ি বেজে উঠল। সিঁড়ির পাশে যে ঘড়িটা দেখেছিল সুধীন সেটাই বোধহয়।

'বারোটা,' বললেন গগন চৌধুরী। 'এইবার আসবেন।'

'কে?'—সুধীনের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম চাপা ও রুক্ষ। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

'আজকে যিনি বসবেন তিনি। ওই তাঁর পায়ের শব্দ।'

সুধীন শ্রবণশক্তিটা এখনও হারায়নি, তাই সে স্পষ্ট পেল বাইরে নিচ থেকে জুতোর শব্দ।

'এসে দেখুন।'—গগন চৌধুরী এগিয়ে গেছেন পাশের একটা জানালার দিকে। 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় এসে দেখুন।'

এও কি সেই সম্মোহনী শক্তি? যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে সুধীন গগন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর তার অজান্তেই একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে—

'একে যে চিনি!'

সেই দৃপ্ত মিলিটারি ভঙ্গি, সেই দীর্ঘ গড়ন, সেই ছাই রঙের সাফারি সুট।

ইনিই ছিলেন সুধীনের বস্—নগেন্দ্র কাপুর।

সুধীনের মাথা ঘুরছে। টাল সামলানোর জন্য সে ইজেলটাকে জাপটে ধরে ফেলল।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ উপরে উঠে আসছে। কাঠের সিঁড়িতে জুতোর ক্রমবর্ধমান শব্দে সমস্ত বাড়ি গমগম করছে।

এবার আওয়াজ থামল।

নৈঃশব্দের মধ্যে গগন চৌধুরী মুখ খুললেন আবার।

'যোগস্থাপনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না, সুধীনবাবু? ভেরি সিম্পল—এই ভাবে হাতছানি দিলেই চলে আসে!'

সুধীন বিস্ফারিত চোখে দেখল দোরোখা শালের ভিতর থেকে গগন চৌধুরীর ডান হাতটা বেরিয়ে সামনে প্রসারিত। সে হাতে মাংস, চামড়া কিছুই নেই—খালি হাড়!

'যে হাতে ডাকা, সে হাতেই আঁকা!'

সংজ্ঞা হারাবার আগের মুহূর্তে সুধীন শুনল স্টুডিওর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে টোকা পড়ছে—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

'দাদাবাবু ! দাদাবাবু !'

এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দিনের আলোয় সুধীনকে আবার তখনই চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে নিতে হল। বাপ্‌রে—কী ভয়ংকর স্বপ্ন !

'দরজা খুলুন ! দাদাবাবু !'

চাকর অধীরের গলা।

'দাঁড়া, এক মিনিট।'

সুধীন বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। অধীরের মুখে গভীর উদ্বেগ।

'আপনি এত বেলা অবধি—'

'জানি। ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে।'

'এত হৈ হল্লা বাড়ির সামনে, কিছুই টের পেলেন না ?'

'হৈ হল্লা ?'

'চৌধুরীবাড়ির বড়বাবু যে মারা গেলেন কাল রাত্তিরে। গগনবাবু। চৌরাশি বছর বয়স হয়েছেল। ভুগছিলেন তো অনেকদিন। ঘরে বাতি জ্বালা থাকত রাত্তিরে দেখেননি ?'

'তুই জানতিস ওঁর অসুখ ?'

'জানব না ? ওনার চাকর ভগীরথ—তার সঙ্গে তো দেখা হয় রোজ বাজারে।'

'বোঝো !'

অনুকূল

'এর একটা নাম আছে তো ?' নিকুঞ্জবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বই কি।'

'কী বলে ডাকব ?'

'অনুকূল।'

চৌরঙ্গিতে রোবট সাপ্লাই এজেন্সির দোকানটা খুলেছে মাস ছয়েক হল। নিকুঞ্জবাবুর অনেক দিনের শখ একটা যান্ত্রিক চাকর রাখেন। ইদানীং ব্যবসায় বেশ ভালো আয় হয়েছে, তাই শখটা মিটিয়ে নেবার জন্য এসেছেন।

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে চাইলেন। এটা হচ্ছে যাকে বলে অ্যান্ড্রয়েড, অর্থাৎ যদিও যান্ত্রিক, তাও চেহারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেহারার কোনো তফাত নেই। দিব্যি সুশ্রী দেখতে, বয়স মনে হয় বাইশ-তেইশের বেশি নয়।

'কী ধরনের কাজ করবে এই রোবট ?' জিজ্ঞেস করলেন নিকুঞ্জবাবু। ডেস্কের উল্টো দিকের ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সাধারণ চাকর যা পারে, ও তার সবই পারবে। কেবল রান্নাটা জানে না। তা ছাড়া, ঘর ঝাড়পোঁছ করা, বিছানা পাতা, কাপড় কাচা, চা দেওয়া, দরজা জানালা খোলা বন্ধ করা—সবই পারবে। তবে হ্যাঁ—ও যা কাজ করবে সবই বাড়িতে। ওকে দিয়ে বাজার করানো চলবে না, বা পান-সিগারেট আনাতে পারবেন না। আর ইয়ে—ওকে কিন্তু তুমি বলে সম্বোধন করবেন। তুইটা ও পছন্দ করে না।'

'এমনি মেজাজ-টেজাজ ভালো তো ?'

'খুব ভালো। সে-দিক দিয়ে ট্রাবল আসবে যদি আপনি কোনো কারণে ওর গায়ে হাত তোলেন। আমাদের রোবটরা ওটা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না।'

'সেটার অবিশ্যি কোনো সম্ভাবনা নেই ; কিন্তু ধরুন, যদি কেউ ওকে একটা

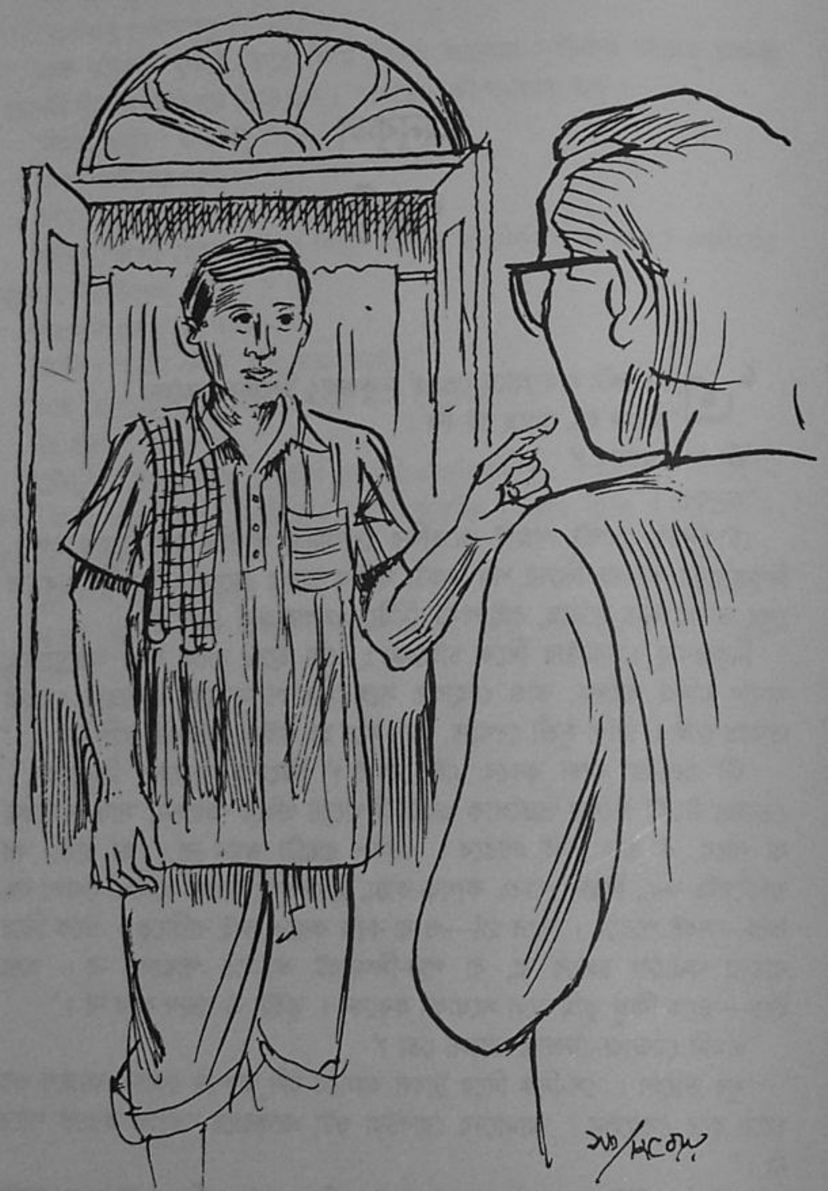

চড় মারল, তাহলে কী হবে ?'

'তাহলে ও তার প্রতিশোধ নেবে।'

'কী ভাবে ?'

'ওর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে ও হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শক দিতে পারে।'

'তাতে মৃত্যু হতে পারে ?'

'তা পারে বই কি। আর আইন এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারে না, কারণ রক্ত-মাংসের মানুষকে যে শাস্তি দেওয়া চলে, যান্ত্রিক মানুষকে তা চলে না। তবে এটা বলতে পারি যে, এখনো পর্যন্ত এরকম কোনো কেস হয়নি।'

'রাত্তিরে কি ও ঘুমোয় ?'

'না। রোবটরা ঘুমোয় না।'

'তাহলে এতটা সময় কী করে ?'

'চুপ করে বসে থাকে। রোবটের ধৈর্যের অভাব নেই।'

'ওর কি মন বলে কোনো বস্তু আছে ?'

'ওরা এমন অনেক কিছু বুঝতে পারে, যা সাধারণ মানুষ পারে না। এ গুণটা সব রোবটের যে সমান পরিমাণে থাকে তা নয় ; এটা খানিকটা লাকের ব্যাপার। এ গুণটা সময়ে প্রকাশ পায়।'

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে ফিরে বললেন, 'অনুকূল, আমার বাড়িতে কাজ করতে তোমার আপত্তি নেই তো ?'

'কেন থাকবে ?' ষোলো আনা মানুষের মতো গলায় বলল অনুকূল। তার পরনে একটা নীল ডোরা কাটা শার্ট আর কালো হাফপ্যান্ট, বাঁ পাশে টেরি আর পাট করে আঁচড়ানো চুল, গায়ের রং বেশ ফরসা, দাঁতগুলো ঝকঝকে আর ঠোঁটের কোণে সব সময়ই যেন একটা হালকা হাসি লেগে আছে। চেহারা দেখে মনে বেশ ভরসা আসে।

'তাহলে চলো।'

নিকুঞ্জবাবুর মারুতি ভ্যান দোকানের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, অনুকূলের জন্য চেকটা দিয়ে রসিদ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, ভৃত্যের হাঁটাচলা দেখেও সে যে যান্ত্রিক মানুষ, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

নিকুঞ্জবাবু বাড়ি করেছেন সল্ট লেকে। বিয়ে করেননি, তবে বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আছে, তারা সন্ধ্যাবেলা আসে তাস খেলতে। তাদের আগে থেকেই বলা ছিল যে, বাড়িতে একটি যান্ত্রিক চাকর আসছে। কেনার আগে অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবু খোঁজ নিয়ে নিয়েছিলেন। এই ক'মাসে কলকাতার বেশ কিছু উপরের

মহলের বাড়িতে রোবট-ভৃত্য বহাল হয়েছে। মানসুখানি, গিরিজা বোস, পঙ্কজ দত্তরায়, মিঃ ছাবরিয়া—সকলেই বললেন তাঁরা খুব স্যাটিসফাইড, এবং তাঁদের চাকর কোনো ট্রাবল দিচ্ছে না। 'মুখ খুলতে না খুলতেই ফরমাশ পালন করে আমার জীবনলাল', বললেন মানসুখানি। 'আমার তো মনে হয় ও শুধু যন্ত্র নয়, ওর মাথার মধ্যে মগজ আছে আর বুকের মধ্যে কলিজা আছে।'

সাতদিনের মধ্যে নিকুঞ্জবাবুরও সেই একই ধারণা হল। আশ্চর্য পরিপাটি কাজ করে অনুকূল। শুধু তা-ই নয়, কাজের পারম্পর্যটাও সে বোঝে। বাবু স্নানের জল চাইলে সেটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সাবান তোয়ালে যথাস্থানে রেখে বাবু কী কাপড় পরবেন, কী জুতো পরবেন স্নান করে এসে, সেটাও পরিপাটি করে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে দেয়। আর সব ব্যাপারেই সে এত ভব্য যে তাকে তুমি ছেড়ে তুই বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নিকুঞ্জবাবুর বন্ধুদের অনুকূলকে মেনে নিতে একটু সময় লেগেছিল—বিশেষত বিনয় পাকড়াশি নিজের বাড়ির চাকরদের তুই বলে এমন অভ্যস্ত যে, অনুকূলকেও একদিন তুই বলে ফেলেছিলেন। তাতে অনুকূল গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমাকে তুই বললে কিন্তু তোকেও আমি তুই বলব।'

এরপর থেকে বিনয়বাবু আর কোনোদিন এ-ভুলটা করেননি।

নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে অনুকূলের একটা বেশ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল। অনুকূল বেশির ভাগ কাজই হুকুম দেবার আগেই করে ফেলে। এটা অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবুর বেশ আশ্চর্য বলে মনে হয়, কিন্তু রোবট সাপ্লাই এজেন্সির মিঃ ভৌমিক বলেছিলেন যে, তাঁদের কোনো-কোনো রোবটের মস্তিষ্ক বলে একটা পদার্থ আছে, চিন্তাশক্তি আছে। অনুকূল নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর রোবটের মধ্যেই পড়ে গেছে। ঘুমোনোর ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিকুঞ্জবাবু ভৌমিকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। যে এতটাই মানুষের মতো, সে সারারাত জেগে বসে থাকবে, এও কি সম্ভব ? ব্যাপারটা যাচাই করতে তিনি একদিন মাঝরাত্তিরে চুপিসাড়ে অনুকূলের ঘরে ডাক দিতেই অনুকূল বলে উঠল, 'বাবু, আপনার কি কোনো দরকার আছে ?' নিকুঞ্জবাবু অপ্রস্তুত হয়ে 'না' বলে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

অনুকূলের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়াও অন্য কথা বলে দেখেছেন নিকুঞ্জবাবু। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়েছেন অনুকূলের জ্ঞানের পরিধিটা কত বিস্তীর্ণ। খেলাধূলা বায়স্কোপ থিয়েটার নাটক নভেল, সব কিছু নিয়েই কথা বলতে পারে অনুকূল। আর সত্যি বলতে কি, অনুকূল এসব বিষয় যত জানে, নিকুঞ্জবাবু তার অর্ধেকও জানেন না। বাহাদুরি বলতে হবে এই রোবট প্রস্তুতকারকদের। কত কী জ্ঞান পুরতে হয়েছে ওই যন্ত্রের মধ্যে !

কিন্তু সুসময়েরও শেষ আছে।

অনুকূল আসার এক বছরের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু তাঁর ব্যবসায়ে কতকগুলো বেচাল চেলে তাঁর আর্থিক অবস্থার বেশ কিছুটা অবনতি করে ফেললেন। অনুকূলের জন্য মাসে তাঁর ভাড়া লাগে দু' হাজার টাকা। সে-টাকা এখনো তিনি নিয়মিত দিয়ে আসছেন, কিন্তু কতদিন পারবেন সেটাই হল প্রশ্ন। এবার একটু বেশি হিসেব করে চলতে হবে নিকুঞ্জবাবুকে। রোবট এজেন্সির নিয়ম হচ্ছে যে, এক মাসের ভাড়া বাকি পড়লেই তাঁরা রোবটকে ফেরত নিয়ে নেবে।

কিন্তু হিসেবে গণ্ডগোল করে দিল একটা ব্যাপার।

ঠিক এই সময় নিকুঞ্জবাবুর সেজোকাকা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'চন্দননগরে একা-একা আর ভালো লাগছে না, তাই ভাবলুম তোর সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে যাই।'

নিকুঞ্জবাবুর এই সেজোকাকা—নাম নিবারণ বাঁড়ুজ্যে—মাঝে-মাঝে ভাইপোর কাছে এসে ক'টা দিন থেকে যান। নিকুঞ্জবাবুর বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তিন কাকার মধ্যে একমাত্র ইনিই অবশিষ্ট। খিটখিটে মেজাজের মানুষ, শোনা যায় ওকালতি করে অনেক পয়সা করেছেন, তবে বাইরের হালচালে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আসলে ভদ্রলোক বেজায় কঞ্জুষ।

'কাকা, এসেই যখন পড়েছেন যখন থাকবেন বই কি', বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'কিন্তু একটা ব্যাপার গোড়াতেই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমার একটি যান্ত্রিক চাকর হয়েছে। আজকাল কলকাতায় কয়েকটা রোবট কোম্পানি হয়েছে জানেন তো ?'

'তা তো জানি', বললেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। কিন্তু চাকরের জাতটা কী শুনি। আমার আবার ওদিকে একটু কড়াকড়ি জানই তো। এ কি রান্নাও করে নাকি ?'

'না না না', আশ্বাস দিলেন নিকুঞ্জবাবু। 'রান্নার জন্য আমার সেই পুরানো বৈকুণ্ঠই আছে। কাজেই আপনার কোনো ভাবনা নেই। আর ইয়ে, এই চাকরের নাম অনুকূল, আর একে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে হয়। 'তুই'টা ও পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করে না ?'

'না।'

'ওর পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলতে হবে বুঝি আমাকে ?'

'শুধু আপনাকে না, সকলকেই। তবে ওর কাজে কোনো ত্রুটি পাবেন না।'

'তা তুই এই ফ্যাসাদের মধ্যে আবার যেতে গেলি কেন ?'

'বললাম তো—ও কাজ খুব ভাল করে।'

'তাহলে একবার ডাক তোর চাকরকে ; আলাপটা অন্তত সেরে নিই।'

নিকুঞ্জবাবু ডাক দিতেই অনুকূল এসে দাঁড়াল। 'ইনি আমার সেজোকাকা', বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'এখন আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

'ও বাবা, এ তো দেখি পরিষ্কার বাংলা বলে,' বললেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে। 'তা বাপু দাও তো দেখি আমার জন্য একটু গরম জল করে। চান করব। বাদলা করে হঠাৎ কেমন জানি একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, তবে আমার আবার দু'বেলা স্নান না করলে চলে না—সারা বছর।'

'যে আজ্ঞে।'

অনুকূল ঘর থেকে চলে গেল আজ্ঞাপালন করতে।

নিবারণবাবু এলেন বটে, কিন্তু নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। মাঝখান থেকে সান্ধ্য আড্ডাটি ভেঙে গেল। একে তো খুড়োর সামনে জুয়াখেলা চলে না, তার উপর নিকুঞ্জবাবুর সে সংস্থানও নেই।

এদিকে কাকা কতদিন থাকবেন তা জানা নেই। তিনি মর্জিমাফিক আসেন, মর্জিমাফিক চলে যান। এবার তাঁর হাবভাবে মনে হয় না তিনি সহজে এখান থেকে নড়ছেন। তার একটা কারণ এই যে, অনুকূল সম্বন্ধে তাঁর একটা অদ্ভুত মনোভাব গড়ে উঠেছে। তিনি এই যান্ত্রিক ভৃত্যটি সম্পর্কে যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুভব করছেন। চাকর যে ভালো কাজ করে, সেটা তিনি কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু চাকরের প্রতি ব্যবহারে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করাটাও তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। একদিন ভাইপোকে বলেই ফেললেন, 'নিকুঞ্জ, তোর এই চাকরকে নিয়ে কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার খুব মুশকিল হচ্ছে।'

'কেন কাকা ?' নিকুঞ্জবাবু ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'সেদিন সকালে গীতার একটা শ্লোক আওড়াচ্ছিলাম, ও ব্যাটা আমার ভুল ধরে দিলে। ভুল যদি হয়েই থাকে, সেটা সংশোধন করা কি চাকরের কাজ ? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি ? ইচ্ছা করছিল ওর গালে একটা থাপ্পড় মেরে দিই, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।'

'ওই থাপ্পড়টা কখনো মারবেন না কাকা—ওতে ফল খুব গুরুতর হতে পারে। ওর ওপর হাত তোলা একেবারে বারণ। আপনি তার চেয়ে বরং ও কাছাকাছি থাকলে গীতা-টিতা আওড়াবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় একেবারে চুপ থাকলে।'

নিবারণবাবু গজগজ করতে লাগলেন।

এদিকে নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। অনুকূলের জন্য মাসে দু'

হাজার করে দিতে এখন ওঁর বেশ কষ্টই হচ্ছে। একদিন অনুকূলকে ডেকে কথাটা বলেই ফেললেন।

'অনুকূল, আমার ব্যবসায় বড় মন্দা চলেছে।'

'সে আমি জানি।'

'তা তো জানো, কিন্তু তোমাকে আমি আর কদ্দিন রাখতে পারব জানি না। অথচ তোমার উপর আমার একটা মায়া পড়ে গেছে।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন এই নিয়ে।'

'কী নিয়ে ?'

'আপনার অবস্থার যদি কিছু উন্নতি করা যায়।'

'সে কি তুমি ভেবে কিছু করতে পারবে ? ব্যবসাটা তো আর তোমার লাইনের ব্যাপার নয়।'

'তবু দেখি না ভেবে কিছু করা যায় কি না।'

'তা দেখ। কিন্তু সেরকম বুঝলে তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে আসতে হবে। এই কথাটা তোমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম।'

'যে আজ্ঞে।'

দু' মাস কেটে গেল। আজ আষাঢ় মাসের রবিবার। নিকুঞ্জবাবু বুঝতে পারছেন, টেনেটুনে আর দুটো মাস তিনি অনুকূলের ভাড়া দিতে পারবেন। তারপর তাঁকে মানুষ চাকরের খোঁজ করতে হবে। সত্যি বলতে কি, খোঁজ তিনি এখনই আরম্ভ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভালো লাগছে না। তার উপর আবার সকাল থেকে বৃষ্টি, তাই মেজাজ আরো খারাপ।

খবরের কাগজটা পাশে রেখে অনুকূলকে ডাকতে যাবেন এক পেয়ালা চায়ের জন্য, এমন সময় অনুকূল নিজেই এসে হাজির।

'কী অনুকূল, কী ব্যাপার ?'

'আজ্ঞে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী হল ?'

'নিবারণবাবু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার গান করছিলেন, এমন সময় কথার ভুল করে ফেলেন। আমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম, বাধ্য হয়ে ওঁকে সংশোধন করতে হয়। তাতে উনি আমার উপর খেপে গিয়ে আমাকে একটা চড় মারেন। ফলে আমাকে প্রতিশোধ নিতে হয়।'

'প্রতিশোধ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা হাই-ভোল্টেজ শক্ ওঁকে দিতে হয় ওঁর নাভিতে।'

'তার মানে— ?'

'উনি আর বেঁচে নেই। অবিশ্যি যেই সময় আমি শক্‌টা দিই, সেই সময়

কাছেই একটা জোরে বাজ পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম।'

'কাজেই মৃত্যুর আসল কারণটা কী, সেটা আপনার বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'আপনি চিন্তা করবেন না। এতে আপনার মঙ্গলই হবে।'

আর হলও তাই। এই ঘটনার দু'দিন পরেই উকিল ভাস্কর বোস নিকুঞ্জবাবুকে ফোন করে জানালেন যে, নিবারণবাবু তাঁর সম্পত্তি উইল করে রেখে গিয়েছেন তাঁর ভাইপোর নামে। সম্পত্তির পরিমাণ হল সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা।

গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট

সুখময় সেনের বয়স পঁয়ত্রিশ। এই বয়সেই সে চিত্রকর হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। পোর্ট্রেটেই তার দক্ষতা বেশি। সমঝদারেরা বলে সুখময় সেনের আঁকা কোনো মানুষের প্রতিকৃতি দেখলে সেই মানুষের জ্যান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বহু প্রদর্শনীতে তার আঁকা পোর্ট্রেট দেখানো হয়েছে, শিল্প সমালোচকেরা তার প্রশংসা করেছে।

কিন্তু শিল্পীরা সবসময় এক পথে চলতে ভালোবাসে না। সুখময়ও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি তার মনে হয়েছে—পোর্ট্রেট তো অনেক হল, এবার একটু অন্য ধরনের কিছু আঁকলে কেমন হয়। এই অন্য ধরনটা সুখময়ের ক্ষেত্রে হল ল্যান্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার উদ্দেশ্যেই সুখময় হাজির হয়েছে শিলং শহরে।

সুখময় এখনো বিয়ে করেনি, তার বাপ মা দুজনেই জীবিত। দুটি বোন আছে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সুখময় শিলং-এ একাই এসেছে, কারণ শিল্পীর একাকিত্বের প্রয়োজনীয়তা সে প্রবলভাবে অনুভব করে। যখন সে ছবি আঁকে তার পাশে কেউ উপস্থিত থাকলে সেটা সে মোটেই পছন্দ করে না। অবিশ্যি পোর্ট্রেট আঁকা হলে যার ছবি আঁকা হচ্ছে তাকে থাকতেই হয়, কিন্তু আর কেউ নয়। সব শিল্পীর মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়, কিন্তু সুখময়ের মধ্যে এর মাত্রাটা একটু বেশি।

তাই শিলং-এ এসে সেখানকার বিখ্যাত লেকের ছবি সে যখন আঁকছিল ঘাসের উপর ইজেল রেখে, তখন একটি দ্বিতীয় প্রাণীর আবির্ভাবে সে মোটেই সন্তুষ্ট হল না।

'বাঃ, আপনার আঁকার হাত তো খাশা মশাই!' হল আগন্তুকের প্রথম মন্তব্য।

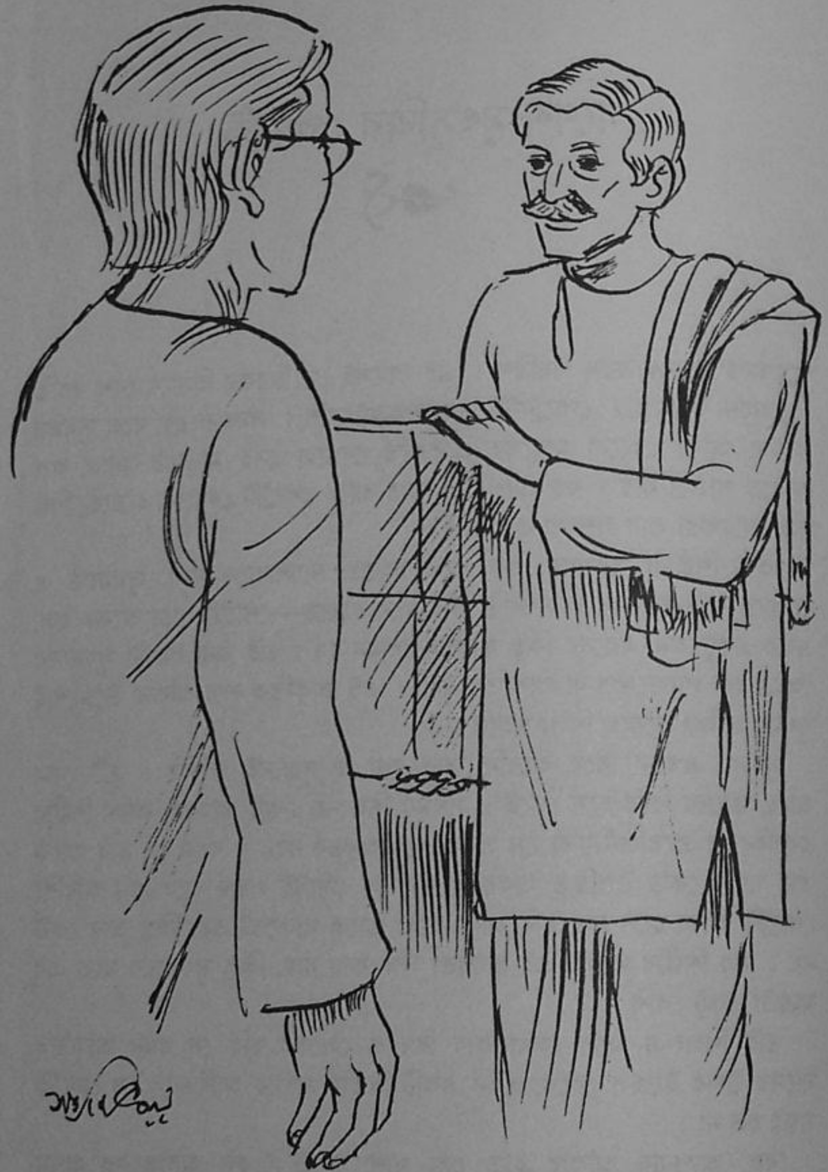

এর কোনো উত্তর হয় না, তাই সুখময় স্মিতহাস্য করে তার তুলি চালিয়ে চলল।

'আমি চিত্রকরদের খুব উঁচুতে স্থান দিই', বললেন আগন্তুক। 'একজিবিশনে যাই সুযোগ পেলেই। আপনার কি কখনো কোনো প্রদর্শনী হয়েছে ?'

এটা একটা প্রশ্ন, কাজেই এর উত্তর দিতে হয়। সুখময় সংক্ষিপ্ততম উত্তরটি বেছে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি ?'

সুখময় নাম বলল।

আগন্তুকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'বলেন কি মশাই ! আপনার নাম তো আমার বিলক্ষণ জানা। আমি যতদূর জানি আপনি তো ল্যান্ডস্কেপ আঁকেন না। আপনার ছবির প্রদর্শনীতে আমি গিয়েছি। সেগুলো সবই পোর্ট্রেট। আপনি হঠাৎ সাবজেক্ট চেঞ্জ করলেন কেন ?'

'স্বাদ বদলের জন্য।' বলল সুখময়। এ ভদ্রলোক তার পাশ সহজে ছাড়বেন বলে মনে হয় না। সুখময় অভদ্রতা এড়ানোর জন্য বাধ্য হয়েই প্রশ্নটা করল।

'আপনি কি শিলং-এই থাকেন ?'

'আজ্ঞে না। আমার এক শালা থাকে লাবানে, আমি তার বাড়িতে দিন দশেকের জন্য এসে উঠেছি। আমার নাম গণেশ মুৎসুদ্দি। কলকাতায় থাকি ; একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

সুখময় যে এতক্ষণ এই ভদ্রলোককে বরদাস্ত করেছে তার একটা কারণ হল এই যে ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, কণ্ঠস্বরও ভালো, নাক চোখা, চাহনি বুদ্ধিদীপ্ত। এই রকম চেহারা দেখলে আপনা থেকেই সুখময়ের পোর্ট্রেট করার ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

'তা আপনি কি মানুষের ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন ?' গণেশ মুৎসুদ্দি প্রশ্ন করলেন।

'পোর্ট্রেট তো অনেক হল,' বলল সুখময়, 'তাই এবার ল্যান্ডস্কেপের দিকে ঝুঁকেছি।'

'আপনি আমার একটা ছবি এঁকে দেবেন ?'

সুখময় রীতিমতো বিস্মিত। এ ধরনের প্রস্তাব ভদ্রলোকের কাছ থেকে সে আশা করেনি। গণেশ মুৎসুদ্দি ঘাসের উপর বসে পড়ে বললেন, 'আমি একটা অভিনব অফার দিচ্ছি আপনাকে। আপনি পোর্ট্রেট আঁকবেন, তবে সাধারণ পোর্ট্রেট নয়।'

'কী রকম ?'

সুখময়ের মনে এখন বিরক্তির জায়গায় কৌতূহল দেখা দিয়েছে। তার

হাতের তুলি হাতেই রয়ে গেছে ; সে তুলি আর কাজ করছে না।

গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'আমার প্রস্তাবটা শুনুন, তারপর আপনার যা বলার বলুন। আমার মনে হয় এটা আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না।'

সুখময় এখনও কোনো আন্দাজ করতে পারছেন না ভদ্রলোক কী বলতে চান। ভদ্রলোকও একটু সময় নিয়ে তাঁর প্রস্তাবটা দিলেন।

'ব্যাপারটা হল এই—আপনি আমার একটা ছবি আঁকুন, কিন্তু সেটা হবে এখনকার চেহারা নয়। আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর পরে আমার যে চেহারা হবে সেইটে আপনার অনুমান করে আঁকতে হবে। আজ হল ১৫ই অক্টোবর ১৯৭০। আপনার ছবিটা আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে আপনার কাছ থেকে কিনে নেব। তারপর আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে—অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর ১৯৯৫—আমি আবার ছবিটি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমার কথার নড়চড় হবে না। যদি দেখা যায় যে আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে এবং ছবির সঙ্গে আমার তখনকার চেহারা মিলে গেছে, তাহলে আমি আপনাকে আরো কিছু টাকা পুরস্কার দেব। রাজি?'

প্রস্তাব যে অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। এমন প্রস্তাব কোনো ব্যক্তি কোনো শিল্পীকে করেছে বলে সুখময়ের জানা নেই। সুখময় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে পারল না। এটা একটা চ্যালেঞ্জই বটে। একজন লোকের আজকের চেহারা পঁচিশ বছরে কী রূপ নেবে সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ; কিন্তু তাও সুখময় একটা আকর্ষণ অনুভব করল। সে বলল, 'ছবি না হয় আমি আঁকলাম, কিন্তু পঁচিশ বছর পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে?'

'আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'আপনার এখনকার ঠিকানা আপনি আমাকে দিন, আমিও আমার ঠিকানা দিচ্ছি। যার ঠিকানা বদল হবে সে অন্যকে জানাবে। এই ব্যাপারে যেন অন্যথা না হয়, নইলে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ভাবে ঠিক পঁচিশ বছর পর আপনার পোর্ট্রেটটি সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। যদি চেহারা মেলে তাহলে আপনি আরো পাঁচ হাজার পাবেন! না হলে অবশ্য টাকার আর কোনো প্রশ্ন উঠছে না ; কিন্তু এটাও বুঝুন যে আপনার কোনো লোকসান হচ্ছে না, কারণ আপনার পারিশ্রমিক আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি।'

সুখময় একটু ভেবে বলল, 'আমি রাজি আছি। শিলং-এই কাজটা হবে তো?'

'তা তো হতেই পারে। আমি এখানে আরো দশদিন আছি, তার মধ্যে আপনার পোর্ট্রেট হয়ে যাবে না?'

'পোর্ট্রেট করতে দিন পাঁচেকের বেশি লাগবে না। আমি আরো সাতদিন

আছি। কালই শুরু করা যাবে তো!'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এমন উদ্ভট প্ল্যান আপনার মাথায় এল কী করে?'

'আমি মানুষটাই একটু রগুড়ে আর খামখেয়ালি। আমাকে যারা চেনে তারা আমার এদিকটা জানে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি তাই আপনার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।'

'আপনার বয়স এখন কত?'

'সাঁইত্রিশ। পঁচিশ বছর পরে আমার বয়স হবে বাষট্টি। আপনি তো বোধহয় আমার চেয়ে ছোট?'

'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ,' বলল সুখময়। 'আশা করি আমরা দুজনই আরো পঁচিশ বছর জীবিত থাকব।'

'সেটা কি জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে?'

'আমার মন তাই বলছে। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

'তাহলে কাল থেকেই কাজ শুরু।'

'হ্যাঁ। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আপনার বাড়িতে আসতে পারি।'

'আঁকার সরঞ্জাম—রং, তুলি, ক্যানভাস, ইজেল—সেখানে পাওয়া যাবে! আমি থাকি লাইমখরা—বাংলো বাড়ি, নাম "কিসমৎ"। এখানে সকলেই ওটাকে স্মিথ সাহেবের বাংলো বলে।'

গণেশ মুৎসুদ্দির আজ থেকে পঁচিশ বছর পরের পোর্ট্রেট আঁকতে সুখময় সেনের লাগল পাঁচ দিন। ছবিটা এঁকে সুখময় বুঝেছে যে এমন চিত্তাকর্ষক কাজ সে কোনোদিন করেনি। অন্য পোর্ট্রেট আঁকতে শুধু পর্যবেক্ষণেরই প্রয়োজন হয়, এ ক্ষেত্রে একটা দূরদৃষ্টি সুখময়ের সব সময়ই প্রয়োগ করতে হচ্ছিল যেটা এর আগে কখনই প্রয়োজন হয়নি। গণেশ মুৎসুদ্দির মাথা ভর্তি চুল, কিন্তু সুখময় লক্ষ করেছে যে সে চুলের জাত পাতলা। তাই পঁচিশ বছর পরে তার মাথায় একটা বিস্তীর্ণ টাক দিয়েছে সুখময়। তাছাড়া সুখময়ের মন বলেছে এ ব্যক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোটা হবে না, রোগাই থাকবে। তাই ছবিতে মুখের ভাবটা শীর্ণ করেছে। গাল বসা, চোখের কোণে বলিরেখা, কানের পাশে চুলে পাক, থুৎনির নীচে ঈষৎ লোল চর্ম—এই সবই সুখময় এঁকেছে। তাছাড়া ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দিয়েছে। কারণ তার মন বলেছে গণেশ মুৎসুদ্দির জীবনটা মোটামুটি সুখের হবে।

ছবি দেখে গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, "বাঃ, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুটা আমার বাবার এখনকার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আর মনে হয় আমাকে মেক-আপ দিলেও এই চেহারা দাঁড় করানো যায়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আবার পঁচিশ বছর পরে দেখা হবে, আপাতত আপনার পারিশ্রমিকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

শিলং লেকের ছবি শেষ করার জন্য সুখময়কে আরো কদিন থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এ কদিনে আর গণেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে দেখা হয়নি। লোকটা যে ভারী অদ্ভুত এ চিন্তা সুখময়ের মনে অনেকবার উদয় হয়েছে। পঁচিশ বছর পরে কি সে সত্যিই আবার আসবে ? সেটা বলার কোনো উপায় নেই। এই পঁচিশ বছরে কত কী ঘটতে পারে এটা ভেবে সুখময়ের মাথা ভোঁ ভোঁ করে উঠল।

সুখময় সেন পোর্ট্রেট এঁকে যেমন নাম করেছিল, ল্যান্ডস্কেপ এঁকে তেমন করেনি। সমালোচকের মন্তব্য তাকে পীড়া দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার কিছুটা সে না মেনেও পারেনি। দৈনিক বার্তা কাগজের চিত্রসমালোচক অম্বুজ সান্যাল সুখময় সেন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনায় অনুযোগ করলেন যে প্রাচীন পথ ধরে চলাই হচ্ছে সুখময়ের উদ্দেশ্য। অথচ তার তুলির জোর আছে। রঙের উপর দখল আছে, টেকনিকে সে দক্ষ ; তাহলে সে পুরনো পথ ছেড়ে আজকের রীতি অবলম্বন করবে না কেন ? আর্ট তো চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না ; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রীতিনীতি পরিবর্তন হয়। সুখময়কে মডার্ন হতেই হবে। নইলে তার কাজে অবসাদের ছায়া আসতে বাধ্য।

১৯৭৫-এর মে মাসের প্রদর্শনীতে সুখময়ের নতুন ঢং-এর কাজের নমুনা দেখা গেল। দু'একজন সমালোচক প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু ছবি বিক্রী হল না। অথচ সুখময় পেশাদারী চিত্রকর, ছবি এঁকেই তাকে পেট চালাতে হয়।

এদিকে গোলমাল যা হবার তা হয়ে গেছে। মডার্ন আর্ট করতে গিয়েই সুখময়ের কাল হল। জীবনে সে প্রথম টের পেল অর্থাভাব কাকে বলে। নবীন নস্কর লেনে তার ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘরে সে বাস করে। তার সঙ্গে এতদিন ছিলেন তার মা ও বাবা। ১৯৮০-র ডিসেম্বরে সুখময়ের বাপের মৃত্যু হল। মার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সুখময় বিয়ে করেনি। ভাগ্যিস !—কারণ ১৯৭০-এর সুখময় আর ১৯৮০-র সুখময়ে অনেক পার্থক্য। শিল্পী হিসাবে তার যে আত্মপ্রত্যয় ছিল সেটা সে হারিয়েছে। মডার্ন আর্ট সে এখনও করছে এবং স্বল্পমূল্যে কয়েকটা বিক্রীও হয়, কিন্তু তাতে সংসার চলে না।

১৯৮৫-তে সুখময়কে মাঝে মাঝে ফিল্মের বিজ্ঞাপন আঁকতে শুরু করতে হল। তেলরঙে আঁকা বিরাট বিজ্ঞাপন রাস্তায় টাঙানো হবে ; কে সে ছবি এঁকেছে তা কেউ জানতে চাইবে না। অত্যন্ত হীন জীবিকা, কিন্তু এছাড়া গতি নেই। ফ্ল্যাটের তিনটে ঘরের একটা ভাড়া হয়ে গেল। তাতে এক জ্যোতিষী এসে উঠলেন, নাম ভবেশ ভট্টাচার্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল সুখময়ের।

সুখময়ের ভবিষ্যৎ গণনা করে কিন্তু জ্যোতিষী মশাই কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না।

১৯৮৬-র কোনো একটা সময়ে জীবন সংগ্রামের চাপে পড়ে সুখময়ের স্মৃতি থেকে শিলং-এর ঘটনাটা বেমালুম লোপ পেয়ে গেল। এই স্মৃতি লোপ পাওয়ার ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত ; কখন যে সেটা ঘটে তা কেউ বলতে পারে না।

১৯৮৬-তে সুখময়ের মা মারা গেলেন। এখন সুখময় একেবারে একা। তার সুদিনে তার যে কিছু বন্ধু জুটেছিল—প্রণব, সাত্যকি, অরুণ—এরা সকলেই সুখময়ের দুর্দিনে সরে পড়েছে। সুখময়ের বয়স এখন বাহান্ন। এই বয়সেই রাত্তিরের টিমটিমে আলোতে সাইনবোর্ড এঁকে এঁকে তার চোখে ছানির উপক্রম দেখা দিয়েছে। অথচ বাড়িওয়ালার তাগাদা এড়াতে তাকে ক্রমাগত কাজ করে যেতেই হচ্ছে। বাড়িওয়ালা আগে যিনি ছিলেন তিনি মোটামুটি ভদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি মরে গিয়ে তাঁর বড় ছেলে এখন তাঁর স্থান অধিকার করেছেন। ইনি পয়লা নম্বর চামার ; এঁর মুখে কিছু আটকায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে গালিগালাজও সুখময়ের গা সওয়া হয়ে গেছে !

সময় কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে ১৯৯৫ সাল এসে পড়ল। সুখময়ের এখন আর একটি কাঁচা চুলও অবশিষ্ট নেই।

অক্টোবরের পনেরই—সেদিন বিজয়া দশমী—সুখময়ের ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। সুখময় দরজা খুলে দেখল—একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মাথায় ঢেউ খেলানো পাকা চুল আর নাকের নিচে একটি জাঁদরেল গোঁফ। ভদ্রলোকের হাতে একটি বেশ বড় চতুষ্কোণ খবরের কাগজের মোড়ক, দেখলে মনে হয় হয়তো ছবি আছে। সুখময় ভদ্রলোককে দেখে সন্তুষ্ট হল না। এখন তার অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলার মেজাজ নেই। বাড়ি ভাড়া সাত মাসের বাকি পড়েছে, বাড়িওয়ালা শাসিয়ে গেছেন এবারে মিটিয়ে না দিলে তিনি জোর করে তাকে ঘর ছাড়া করবেন। গুণ্ডার সাহায্যে সবই সম্ভব।

আগন্তুকের মুখে কিন্তু হাসি। ঘরের ভিতরে ঢুকে বললেন, 'ভুলে গেছেন বুঝি ?'

সুখময় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজ কী তারিখ ?'

'পনেরই অক্টোবর।'

'কী সন ?'

'১৯৯৫।'

'তাও কিছু মনে পড়ছে না ? শিলং-এর সেই ঘটনা বেমালুম ভুলে গেলেন ?'

প্রশ্নটা করতেই—আর হয়তো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনেই—সুখময়ের মনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক ঝলকে তার সব কথা মনে পড়ে গেল—কেবল ভদ্রলোকের নামটা ছাড়া।

'মনে পড়েছে', বলে উঠল সুখময়। 'আপনার একটা পোর্ট্রেট করেছিলাম আমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু আমি তো হেরে গেলাম। আপনার মাথা ভর্তি চুল, আপনার গোঁফ, আপনার ঝুলপি এসব তো কিছুই আমি আঁকিনি।'

'আমার চেহারা দেখে কারুর কথা মনে পড়ছে ?

এটা সত্যি কথা বটে। ভদ্রলোককে দেখেই সুখময়ের কেমন যেন চেনা লেগেছিল।

'আপনি বাংলা ফিল্ম দেখেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'তা দেখি না, তবে বাংলা ছবির বিজ্ঞাপন আঁকি।'

'মণীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটা চেনা লাগছে কি ?'

ঠিক কথা। এই মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় নামকরা চলচ্চিত্র অভিনেতা। বয়স হয়েছে, নায়কের অভিনয় করেন না, তবে জাঁদরেল চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সুখময় বলল, 'এবার চিনেছি। আপনি ক্যারেকটার রোল করেন। খুব জনপ্রিয় অভিনেতা। আমি ফিল্মের বিজ্ঞাপনে আপনার ছবি এঁকেছি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সেটা হল আমার আজকের পরিচয়। মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নামে আপনি আমাকে চিনতেন পঁচিশ বছর আগে। সে নাম হল গণেশ মুৎসুদ্দি।'

'ঠিক কথা,' বলল সুখময়। 'আমি আপনার একটি পোর্ট্রেট করি—পঁচিশ বছর পরে আপনার যে চেহারা হবে সেটা অনুমান করে। সে ছবির কথা আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। কিন্তু সে চেহারার সঙ্গে আপনার আজকের চেহারার কোনো মিল নেই। কাজেই আমি কৃতকার্য হইনি। হলে আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু সে টাকাও আমি দাবি করতে পারি না। কাজেই—'

'দাঁড়ান, আপনাকে সে ছবিটা দেখাই', বলে ভদ্রলোক মোড়ক খুলে ছবিটা টেবিলের উপর দাঁড় করালেন। তারপর বললেন, 'ভুলবেন না আমি অভিনেতা। এবার দেখুন আমার দিকে।'

সুখময় ভদ্রলোকের দিকে চাইল। ভদ্রলোক এক টানে তার গোঁফ আর মাথার চুল খুলে ফেললেন। সুখময় অবাক হয়ে দেখল তার সামনে হুবহু তার পোর্ট্রেটের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গণেশ মুৎসুদ্দি।

'এটাই আমার আসল চেহারা,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'এই চেহারা আপনি অদ্ভুত ক্ষমতাবলে পঁচিশ বছর আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আমি তখন ছিলাম ইনশিওরেন্স কোম্পানির চাকুরে। কিন্তু অভিনয়ের শখ আমার তরুণ বয়স থেকেই। একবার এক বন্ধু পরিচালকের অনুরোধে পড়ে একটা বাংলা ছবিতে অভিনয় করি। প্রচুর সুনাম হয়। সেই থেকেই আমি অভিনেতা। নামটা বদলে নিই প্রথমেই। অর্থাৎ সবটাই আমার মুখোশ। টাক পড়ে যাচ্ছিল দেখে ফিল্মে পরচুলা ব্যবহার করতে শুরু করি। একটা গোঁফও নিই সেই সঙ্গে। আমার এই চেহারাটাই দর্শক পছন্দ করে। কিন্তু আমার আসল চেহারা হল এই ছবির চেহারা। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম চেহারা মিললে পুরস্কার দেব। এই নিন সেই পুরস্কার।'

সুখময় দেখল যে তার হাতে চলে এসেছে একটি কুড়ি হাজার টাকার চেক। এবার গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'শুনুন, আমি অভিনয় করি বলে যে আর্টের প্রদর্শনীতে যাই না তা নয়। আপনার এ মতিভ্রম হল কেন ? আপনার পোর্ট্রেটে এত সুন্দর হাত—আপনি সেই ছেড়ে অন্য লাইনে গেলেন কেন ?'

সুখময় আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

'আমি আপনাকে বলছি,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি, 'আপনি সমালোচকের কথা ভুলে যান। আপনি আবার পোর্ট্রেট আঁকতে শুরু করুন। আমার ধারণা আপনার হাত এখনো নষ্ট হয়নি।'

গণেশ মুৎসুদ্দি ছবিটা আবার মোড়কে পুরে নিয়ে বললেন, 'আমি তাহলে আসি। আমার অ্যাডভাইসটা অগ্রাহ্য করবেন না।'

সুখময় করেনি অগ্রাহ্য, এবং তাতে আশ্চর্য ফল পেয়েছিল। ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে তার আঁকা পোর্ট্রেটের প্রদর্শনীতে নতুন করে তার দক্ষতার সুখ্যাতি হল। আর সেই সঙ্গে ছবি বিক্রীও হল ভালো।

শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত

'আমার এখন যে চেহারা দেখছিস', বললেন তারিণীখুড়ো, 'তা থেকে আমার ইয়াং বয়সের চেহারা তোরা কল্পনাই করতে পারবি না।'

'কীরকম চেহারা ছিল আপনার, খুড়ো?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা, 'ধর্মেন্দরের মতো?'

'ঘ্যা ঘ্যাঃ!' বললেন খুড়ো, 'ওরকম নাসপাতিমার্কা চেহারা নয়। টক্‌টকে রং, ব্যায়াম করা পাকানো শরীর, জামা খুললে প্রত্যেকটি মাস্‌ল আঙুল দিয়ে দেখানো যায়—অ্যানাটমির চার্টের দরকার হয় না।—আর ফিল্ম স্টারের কথা কী বলছিস? কত অফার পেয়েছে জানিস খুড়ো হিরো হবার জন্যে?'

'ইস্—আর আপনি নিলেন না?' বলল ন্যাপলা। 'অবিশ্যি তখন তো বোধহয় সাইলেন্ট ছবি, তাই না?'

'কে বললে সাইলেন্ট? আমি বলছি স্বাধীনতার কয়েক বছর আগের কথা। সাইলেন্ট ছবি তো ফুরিয়ে গেছে ত্রিশ সনের কিছু পরেই।'

'আপনি রিফিউজ করলেন?'

'আলবৎ! একবার একটা ছবিতে করতে হয়েছিল, তবে সেটা অন্য গল্প, আরেকদিন বলব। আসলে ফিল্মের হিরো হবার শখ আমার ছিল না। আমি চেয়েছিলাম আমার গোটা জীবনটাই হবে একটা সিনেমার গপ্‌পো। একটা খাঁটি নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চার। অথবা বলতে পারিস একটা সিরিজ অফ অ্যাডভেঞ্চার্স। রং মেখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াব, ডিরেক্টরমশাই ডুগডুগি বাজাবেন, আর আমি নাচব—এ-শর্মা সে-শর্মা নয়।'

'আজ কোন্ অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় বলবেন, মিস্টার শর্মা?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা। খুড়োকে এ ধরনের কথা বলার সাহস একমাত্র ন্যাপলারই আছে, তবে সেটা খুড়ো বিশেষ মাইন্ড করেন বলে মনে হয় না। বাইরে একটা খিটখিটে ভাব

দেখালেও আসলে ওঁর মনটা নরম একটা জানতাম। বেনেটোলা থেকে বালিগঞ্জে আসেন যে শুধু আমাদের গল্প শোনাবার জন্যই এটা তো মিথ্যে নয়।

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে খুড়ো বললেন, 'নাইনটিন ফর্টি-ফোরে আজমীর। তখন আমার বয়স আটাশ।'

আমরা পাঁচজন—আমি, ভুলু, চটপটি, সুনন্দ আর ন্যাপলা—গল্পের জন্য রেডি হয়ে বসলাম। চা শেষ করে একটা একসপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে খুড়ো আরম্ভ করলেন।

আগ্রায় একটা ব্যাঙ্কের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল ধরণীকাকার কথা। আমার বাবার মাস্তুতো ভাই। তিনি জয়পুরে হোমিওপ্যাথি করে বেশ পসার জমিয়ে বসেছেন। রাজস্থানটা দেখা হয়নি, অথচ ছেলেবেলা থেকেই ও-দেশটার উপর একটা আকর্ষণ রয়েছে। মনে হয় ভারতবর্ষে ওটাই হল সত্যিকারের রোম্যান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের ঘাঁটি। চলে গেলুম কাকার কাছে।

আমি বেকার জেনে কাকার ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তোর মতো একজন জোয়ান ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আজমীর যাবি?' বললুম, 'কী আছে সেখানে?' কাকা বললেন, 'শেঠ গঙ্গারাম আমার পেশেন্ট। পেটের আলসারে ভুগত, আমার ওষুধে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। তার একজন ইংরিজি জানা সেক্রেটারি দরকার। তোর তো ইংরিজিতে অনার্স ছিল। যদি চাস তো তোকে রেকমেন্ড করে দিতে পারি।'

কখন কী কাজে দরকার পড়ে, তাই টাইপিংটা আগেই শেখা ছিল। কাজেই সেক্রেটারির চাকরির পক্ষে আমি অনুপযুক্ত নই। তবু লোকটার সম্বন্ধে একটু ডিটেল জানা দরকার বলে প্রশ্ন করলুম, 'কী করেন গঙ্গারাম?' গঙ্গারাম বললেই উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে—মনে পড়ে যায়।

কাকা বললেন, 'গঙ্গারাম মস্ত ধনী। হীরে জহরতের কারবার। বিদেশে করেসপন্ডেন্স চালাতে হয়। যে সেক্রেটারি ছিল সে নাকি বিয়ে করার নাম করে সেই যে গেছে আর আসেনি।'

'বস্ হিসেবে গঙ্গারাম কি— ?'

'কোনো গোলমাল নেই। তবে ওর একটা ছেলে আছে বছর বারো বয়স, সে নাকি একটি মূর্তিমান বিচ্ছু। সে যদি কিছু করে থাকে।'

আমি বললাম, 'কুছ পরোয়া নেহী। যে ছেলের এখনো গোঁফ গজাবার বয়স হয়নি তাকে আবার ভয় কিসের? ও আমি সামলে নেব।'

'তাহলে আর কী, লেগে পড়। আমি গঙ্গারামকে লিখে দিচ্ছি। আমার

রিকোয়েস্ট ও ঠেলতে পারবে না।'

কাকার এক চিঠিতেই গঙ্গারাম রাজি। লিখলেন, 'সেন্ড ইওর নেফিউ ইমিডিয়েটলি।' একবার অম্বর প্যালেসটায় টুঁ মেরে জয়পুর থেকে চলে গেলাম মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান আজমীরে। আকবর একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন এই শহরে। আজমীর থেকে সাত মাইল পশ্চিমে হিন্দুদের তীর্থস্থান পুষ্কর। সব মিলিয়ে যাকে বলে ঐতিহ্যে মহীয়ান।

প্রথম রাতটায় থাকলাম সার্কিট হাউসে। কাকাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আনাসাগর নামে বিরাট লেকের ধারে এমন সার্কিট হাউস ভারতবর্ষে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে যে দৃশ্য দেখলুম তা জীবনে ভুলব না। হাজার হাঁস চলে বেড়াচ্ছে লেকে, পশ্চিমে তারাগড় পাহাড়, তার পিছনে টেকনিকালার ছবির মতো সানসেট হচ্ছে।

শেঠ গঙ্গারামের গদি এবং বাসস্থান শহরের মধ্যিখানে হলেও, বাড়ির ভেতরে একবার ঢুকে পড়লে সেটা আর বোঝার জো থাকে না। সাতাশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। আর সেটাকে ঘিরে দুর্গের মতো পাঁচিল। আড়াই শো বছরের সোনাদানার ব্যবসা। ঘরে কত যে মহামূল্য রত্ন আর গয়নাগাটি আছে তার হিসেব নেই। সেই জন্যেই এই পাঁচিলের ব্যবস্থা—যদিও তাতেও যে ষোল আনা সেফটি হয় না সেটা পরে বুঝেছিলাম, তবে সে কথা যথাস্থানে প্রকাশ্য।

গঙ্গারামের সঙ্গে সকালে গদিতে দেখা করলুম। ভদ্রলোকের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, ঘি খাওয়া নধর পরিপুষ্ট চেহারা, একবার বসে পড়লে উঠতে গেলে পাশের লোককে হাত ধরে হেল্প করতে হয়। আমায় দেখে প্রশ্ন হল, 'আর ইউ এ বেঙ্গলী?'

এ প্রশ্নের অবশ্যি একটা কারণ আছে। সেটা এখানে বলি।

আগ্রায় থাকতে একদিন ব্যাঙ্কে এক খদ্দের আসে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনিতেই ভালো, তার উপর এক জোড়া তাগড়াই গোঁফ তাতে এমন এক পার্সোন্যালিটি এনে দিয়েছে যে দেখেই ডিসাইড করলুম ও জিনিস আমারও চাই।

আড়াই মাস লেগেছিল গোঁফের ওই শেপ নিতে। মাঝখানটা ভরাট আর পুরু, আর দুটো পাশ যেন দুটো হাতির শুঁড় সেলাম ঠুকছে। কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে থেকে গোঁফ জিনিসটা তখন প্রায় উঠে গেছে, কিন্তু পশ্চিমে অনেকেই ওটার খুব তোয়াজ করে। আর রাজস্থানে তো কথাই নেই।

শেঠজীকে বললুম যে আমি বঙ্গসন্তানই বটে—গোঁফটা নেহাৎ শখের ব্যাপার।

ইংরিজিটা তো মোটামুটি বলতেই পারতুম, দু-বছর আগ্রায় থেকে হিন্দীটাও

সড়গড় হয়ে গেস্‌ল। তার উপর আদব কায়দাগুলো রপ্ত, স্বাস্থ্য ভালো, সব মিলিয়ে গঙ্গারাম খুশিই হলেন। বললেন, 'আমার বাড়িতেই তুমি থাকবে। সকালে বিকেলে আমার কাজ করবে, দুপুরটা আমি ঘুমোই, আর সন্ধেটা তুমি আমার ছেলের টিউশনি করবে। ছেলে চালাক, তবে পড়াশুনোয় মন নেই, ভারী দুরন্ত, সঙ্গদোষে নষ্ট না হয় সেটা তোমাকে দেখতে হবে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি তোমাকে দেব। তবে একটা কথা—আমরা নিরামিষ খাই। মাছ, মাংস খেতে চাইলে তোমাকে বাইরে গিয়ে খেতে হবে। অবিশ্যি শাক-সবজি ফলমূল দুধ-মিষ্টিতে যদি তোমার অরুচি না হয় তাহলে বাইরে যাবার কোনো দরকার হবে বলে মনে করি না।'

নিরামিষ শুনে গোড়ায় মনটা দমে গেস্‌ল, কিন্তু শেঠজীর বাড়ির নিরামিষ রান্না এমনই সুস্বাদু, আর বাড়ির গরুর খাঁটি দুধের মালাই-বালাইয়ের এমনই কোয়ালিটি যে মাছ-মাংসের অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল।

গঙ্গারামের সবসুদ্ধ সাত ছেলে। তার মধ্যে দুটি অল্প বয়সেই মারা গেছে, দুটি আর্মিতে, দুটি বাপের ব্যবসায় যোগ দিয়েছে আর ছোটটি হলেন শ্রীমান মহাবীর বিচ্ছু। আমার সঙ্গে কথা বলে গঙ্গারাম ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে পর 'ইনি তোমার নতুন মাস্টর' বলে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'যাও, এঁকে এঁর ঘর দেখিয়ে দিয়ে এস।'

এমন অস্থির চোখের দৃষ্টি আমি কোনো ছেলের মধ্যে দেখিনি, আর সেই সঙ্গে এমন তীক্ষ্ণ ঝিলিক। সে যে বিচ্ছু তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিও যে বেশ ধারালো সেটা বোঝা যায়।

গদি থেকে বাড়ির ভিতর ঢুকে একটা প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে আরেকটা উঠোনে পৌঁছলাম। তারই পাশে বারান্দার ধারে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে হাজির করল মহাবীর। বোঝাই যাচ্ছে এটা শিস-মহল জাতীয় একটা কিছু ছিল, কারণ ঘরের সারা দেয়াল আয়নার টুকরো দিয়ে মোড়া।

আমাকে পৌঁছে দিয়েই মহাবীর যে কেন চম্পট দিল সেটা মিনিটখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলুম।

ঘরের মেঝেতে দুটি এবং খাটের ওপর একটি জ্যান্ত বিছে অবস্থান করছে। মেঝের দুটি তেঁতুলে, আর খাটের ওপরেরটি একেবারে খোদ কাঁকড়া বিছে। শেষেরটি আপাতত খাটের মধ্যিখান থেকে বালিশ লক্ষ করে এগুচ্ছে। আমি জানি মেঝের দুটি চেহারাতেই যা ভয়ের উদ্রেক করে, কামড়ে বিষ নেই। তবে বিছানার উপরে যেটি, তার ল্যাজের ডগায় বাঁকানো হুলটির ছোবল একেবারে মারাত্মক।

'বিচ্ছু' বিশেষণের তাৎপর্য যে এই ভাবে প্রথম দিনেই বোঝা যাবে সেটা ভাবিনি।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে 'মহাবীর' বলে একটা হাঁক দিলুম। তাতে উত্তর না পেলেও, ডাকের ফলে উল্টোদিকের বারান্দায় স্বয়ং শ্রীমানের আবির্ভাব হল। হেলতে দুলতে সে এসে দাঁড়াল একটা থামের পাশে। আমি তাকে ডাকলুম।

'ইধার আও।'

বিচ্ছু এগিয়ে উঠোনের মাঝবরাবর এসে আবার থামলো।

'হাত দিয়ে বিচ্ছু তুলতে পার ?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

শ্রীমান নিরুত্তর।

'এস। দেখে যাও কী করে তোলে।'

এবার শ্রীমানের কৌতূহল হল। এখানে বলে রাখি আমি নিজেও কোনোদিন হাত দিয়ে কাঁকড়াবিছে তুলিনি। তবে সেটা যে সম্ভব তা জানি, কারণ ছেলেবেলায় গণশা বলে আমাদের একটা চাকর ছিল তাকে এ জিনিস করতে দেখেছি। খপ্‌ করে ঠিক হুলের তলাটা ধরে তুলে ফেললে হুল ফোটাবার আর মওকা পায় না বিছে।

মহাবীর আমার ঘরের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়াল।

আমি দম টেনে এক বুক সাহস নিয়ে দুগ্গা বলে এক ছোবলে খাটের উপর থেকে বিছেটাকে ল্যাজ ধরে তুললুম। তারপর সেটা দু আঙুলে ঝুলিয়ে মহাবীরের মুখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে বললুম, 'বিছেগুলোকে বাইরে ফেলে আসার জন্য একটা পাত্র নিয়ে এস। আর দেখছই তো—আমার যখন ভয় নেই, তখন আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো মজা নেই।'

মহাবীর এক মিনিটের মধ্যেই একটা কাঁচের বৈয়াম নিয়ে এল। তার ভেতরের দেয়ালে লাড্ডুর গুঁড়ো লেগে রয়েছে। তারই মধ্যে প্রথমে কাঁকড়া বিছেটাকে, তারপরে তেঁতুল বিছে দুটো ফেলে বললুম, 'এগুলোকে বাড়ির পাঁচিলের বাইরে ফেলে এস।'

মহাবীর গেল, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে রিপোর্ট করে গেল যে সে আমার আজ্ঞা পালন করেছে।

তারপর থেকে মনে হত যে প্রাইভেট টিউটরের প্রতি তার যে স্বাভাবিক বিরাগ সেটা মহাবীর কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। কতটা কাটিয়েছে সেটা জানা মুশকিল, কারণ এমনিতে সে অত্যন্ত চাপা। পেটে বোমা মারলেও মনের আসল ভাব সে প্রকাশ করবে না। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত চৌকস, কাজেই লেখাপড়ায় যাতে তার মন বসে সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, তাতে সফল হই বা না হই। দুষ্টুমি বন্ধ করার চেষ্টা আমি করিনি, কারণ আমি জানি সেটা মাঠে মারা

যাবে। ত্যাঁদড়ামোর দৌড় যে কতখানি সেটা এক দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবে।

গঙ্গারামের বাড়িতে চারটে ঘোড়া, ছটা উট। একদিন সকালে মনিবের চিঠি টাইপ করছি গদিতে বসে, এমন সময় হঠাৎ সমস্বরে অনেকগুলো উটের আর্তনাদ শুনে আঁৎকে উঠলুম। উটের ডাকের মতো অমন বীভৎস ঘড়ঘড়ে ডাক আর কোনো জানোয়ারের নেই।

কৌতূহল হওয়াতে বাইরে বেরিয়ে দেখি—জোড়া জোড়া উট বোধহয় পরস্পরের দিকে পিঠ করে বসেছিল, কোন্ এক ফাঁকে গিয়ে শ্রীমান এর-ওর ল্যাজে গাঁটছড়ার মতো করে বেঁধে দিয়ে এসেছে। বসা উট দাঁড়িয়ে উঠতে ল্যাজে টান পড়ার ফলেই এই বিকট চিৎকার।

গঙ্গারাম এ ব্যাপারে ভয়ংকর আপসেট হয়ে পড়াতে তাকে বুঝিয়ে বললুম যে এ ধরনের দুষ্টুমির বয়সটা মানুষের খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না ; তোমার ছেলের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে ; সে পড়াশুনোয় ভালো হবে এ গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি, তুমি চিন্তা করো না। এত বলার পর বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মহাবীরকে পড়ানোর টাইম ছিল সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা। একতলার পিছন দিকে আমার ঘরের উল্টোদিকে একটা ঘরে বসে পড়াশুনা হত। আমি গিয়ে বসলেই বেয়ারা এক গেলাস সরবত দিয়ে যেত। সেটা যে কিসের সরবত তা কোনো দিন ঠাহর করতে পারিনি, তবে বলতে পারি এমন সুস্বাদু সুগন্ধী সরবত আর কোনোদিন খাইনি। সরবত শেষ হতে না হতেই ছাত্র এসে পড়তো।

একদিন দেখি ছেলে আর আসে না। আমি ঘড়ি দেখছি থেকে থেকে ; বিশ মিনিট হয়ে গেল, পঁচিশ মিনিট, এক ঘণ্টা, তবু সে আসে না। দেরির কী কারণ হতে পারে বুঝতে পারছি না, এমন সময় হঠাৎ শ্রীমান এসে হাজির।

'কী ব্যাপার বল তো ?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। 'এত দেরি কেন ?'

'তোমায় একটা জিনিস দেখাব তাই', বলল শ্রীমান। 'বাবার নেশা পুরোপুরি না হলে ট্যাঁক থেকে চাবি বার করতে পারছিলাম না।'

সর্বনাশ! বাবার ট্যাঁক থেকে চাবি ? শেঠজী যে গাঁজা জাতীয় একটা কিছু সেবন করেন সন্ধ্যাবেলা সেটা জানতাম।

'কিসের চাবি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সিন্দুকের', বলল শ্রীমান বিচ্ছু।

তারপর পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে ঠক করে টেবিলের উপর রাখল। ল্যাম্পের আলোয় সেটার চোখ ধাঁধানো ঝলসানি আমায় থমকে দিল।

জিনিসটা একটা সোনার লকেট। সাইজে ক্যারামের স্ট্রাইকারের মতো। মাঝখানে একটা আধুলি-প্রমাণ সবুজ মণি, নির্ঘাৎ মরকত বা পান্না,—তাকে ঘিরে

আছে হীরের বলয়, আর তাকে আবার ঘিরে আছে সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্যে বসানো চুনি আর পান্না।

'জাহাঙ্গীর বাদশার জিনিস ছিল এটা', চাপা গলায় বলল মহাবীর। 'বিশ লাখ টাকা দাম। বাবা কাউকে দেখান না, কাউকে বিক্রী করবেন না।'

'আর তুমি এটা সিন্দুক থেকে বার করে নিয়ে এলে?'

'বাঃ, এটা তোমাকে দেখাব না? তোমার দেখা হলে আবার রেখে দিয়ে আসব।'

আমি অবাক হয়ে একবার লকেটের দিকে, একবার মহাবীরের দিকে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল শ্রীমান।

'টোটা সিং-এর নাম শুনেছ?'

'কে টোটা সিং?'

'আসল নাম কেউ জানে না। ডাকু টোটা সিং। পুলিশ ধরে জেলে পুরেছিল, ও জানলার গরাদ হাত দিয়ে বেঁকিয়ে পালিয়ে যায়।'

এবার মনে পড়ল। কোনো একটা কাগজে পড়েছিলাম বটে। রাজপুত ডাকাত, রাজপুত্রেরই মতো চেহারা। ফরসা রং, কিন্তু ডাকাতি করে মিশকালো ভীলদের সঙ্গে। ভারী রহস্যময় চরিত্র। পুলিশ জেরা করেও কিছু জানতে পারেনি। দুর্ধর্ষ সাহসী, আর বন্দুকের অব্যর্থ নিশানা। গায়েও নাকি প্রচণ্ড শক্তি।

'হঠাৎ টোটা সিং-এর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আমাদের বাড়িতে ডাকাত এলে মজা হবে।'

আমি তো থ! বললাম, 'এসব কী বলছ তুমি?'

'গোলাগুলি চলবে, আর মজা হবে না?'

'এসব কথা বোল না, মহাবীর। যদি লোক খুন হয় সেটা কি খুব ভালো হবে?'

মহাবীর আর কিছু বলল না। তার উৎসাহের সঙ্গে আমার উৎসাহ মেলাতে পারলাম না বলে বোধহয় সে কিছুটা হতাশ হল। তাকে লকেটটা দিয়ে বললাম, 'যাও, এটা রেখে এস বাবার সিন্দুকে।'

মহাবীর বাধ্য ছেলের মতো লকেটটা নিয়ে বেরিয়ে আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। সেদিন আর তেমন জমিয়ে পড়াশুনা হল না।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে লকেটটার কথা আর সেই সঙ্গে কী বিপুল ধনদৌলতের মধ্যে রয়েছি আমি সেই কথাটা ভাবছিলাম। আমার ঘরের উপরেই শেঠ গঙ্গারামের ঘর। শেঠজীর ইনসমনিয়া, রাত আড়াইটা তিনটার আগে ঘুম আসে না। নেশার ফলে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একটা তন্দ্রার ভাব আসে। তারপর

দশটা থেকে একেবারে সজাগ। এই ব্যারাম হোমিওপ্যাথিতে সারেনি। তাই শেঠজী অ্যালোপ্যাথির ঘুমের বড়ি খান। কিন্তু যতক্ষণ না ঘুমের আমেজ আসে ততক্ষণ ঘরে পায়চারি করেন। তাঁর পদধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি আমার মাথার উপরে।

ক্রমে সেই পায়ের শব্দও থেমে গেল, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঢংঢং করে গদির ঘরের জাপানী দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল, আর তারই কিছুক্ষণ পরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

একে টেলিপ্যাথি বলব না কী বলব জানি না ; আজই সন্ধ্যায় ডাকাতের কথা হল, আর আজই ডাকত পড়ল শেঠ গঙ্গারামের বাড়ি !

প্রথমে সন্দেহ হল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে। তারপর ঘোড়ার চিঁহিহি আর উটের পরিত্রাহি আর্তনাদ। তারপর হৈ হল্লা আর পর পর তিনটে বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে আমি খাটের উপর সটান উঠে বসলাম। ঘর থেকে বারান্দায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় বেশ কিছু লোকের এক সঙ্গে দ্রুত পায়ের শব্দে সমস্ত বাড়িটা গমগম করে উঠল। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদিকের বারান্দায় প্যাসেজের ভিতর দিয়ে বাইরের উঠোনের যে অংশটা দেখা যায়, তাতে আলোকরশ্মির ছটফটানি দেখে বুঝলাম কে বা কারা যেন টর্চ ফেলছে।

মাথায় রোখ চেপে গেল। শেঠজীই আমাকে একটা রিভলবার দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলুম। বাড়িতে ডাকাত যদি পড়েই থাকে তো এভাবে কেঁচো হয়ে ঘরে বসে থাকলে বাঙালীর মুখে যে কালি পড়বে !

কিন্তু প্যাসেজ দিয়ে বেরনোমাত্র একটা বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে পিছনের একটা কাঁচের জানালাকে চৌচির করে দিল। আমি বেগতিক দেখে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। গোলাগুলি চললে এটাই যে প্রশস্ত পন্থা এটা আমার জানা ছিল। তাও উপুড় অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে রিভলভারের ঘোড়া টিপে একজন বন্দুকধারীর দিকে গুলি চালিয়ে দিলুম। লোকটা আর্তনাদ করে কোমরে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আজ অমাবস্যা, কিন্তু উঠোনের উপরে ছাত নেই বলে তারার আলোতে তবু কিছুটা দেখা যাচ্ছিল।

এই ভাবে কুরুক্ষেত্র চলল মিনিট কুড়ি। শেঠজীর বাড়ি পাহারা দেবার জন্য সশস্ত্র দারোয়ান ছিল গোটা আষ্টেক। কাজেই যুদ্ধ যে শুধু এক তরফাই ঘটেছে তা নয়।

ক্রমে হল্লা, আর্তনাদ, গুলির শব্দ, পায়ের শব্দ ইত্যাদি সব কিছু থামার পর আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। তখন এদিকে ওদিকে বাতি জ্বলতে শুরু

করেছে। ওপর থেকে মেয়েদের ঘোর বিলাপ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যতদূর মনে হয়, রেড সাক্সেসফুল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই মহাবীর দৌড়ে নেমে এল দোতলা থেকে। সে আমার ঘরেই যাচ্ছিল, মাঝপথে আমাকে দেখে থেমে গিয়ে পাকা খবর দিয়ে দিল।

টোটা সিং ডাকাতের দল বিস্তর ধনরত্ন লুট করে নিয়ে চলে গেছে, ইনক্লুডিং শেঠজীর সিন্দুক খুলে জাহাঙ্গীর লকেট। শেঠজী নিজে নাকি বিপদ বুঝে গিন্নী ও মহাবীরকে নিয়ে ছাতে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলে প্রতাপ ও রঘুবীর বন্দুক নিয়ে ডাকাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল—দুজনেই জখম। এ ছাড়া দুটি প্রহরী মরেছে, আরেকটির পায়ে গুলি লেগেছে।

কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়।

পুলিশে ডায়রি ইত্যাদি যা করবার সে তো হলই। এখানে বলে রাখি যে শেষ পর্যন্ত ইনস্পেক্টর যশোবন্ত সিং এবং তাঁর দলের লোকেরা জাহাঙ্গীর লকেট সমেত চোরাই মালের অধিকাংশই উদ্ধার করেছিলেন, ডাকাতদলের সাতজন ধরা পড়েছিল, তবে টোটা সিং উধাও। কিন্তু এ সবের আগে আমাকে জড়িয়ে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ডাকাতির দুদিন পরের সন্ধ্যেবেলা।

ছাত্র পড়ানোর ঘরে গেছি যথারীতি সাতটার সময়, সরবতও খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলাম মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। ছাত্র তখনো আসেনি, এদিকে ক্রমেই বুঝতে পারছি যে চোখের সামনের জিনিসগুলো দেখতে যেন রীতিমতো কষ্ট করে দৃষ্টি ফোকাস করতে হচ্ছে।

কী যে হল কিছুই বুঝতে পারছি না, শুধু এটুকু বুঝছি যে এ অবস্থায় পড়ানো অসম্ভব।

এমন সময় শ্রীমান মহাবীর সিং-এর প্রবেশ। তার হাতে একটা হলদে কাগজ—হ্যান্ডবিলের মতো।

অবাক হয়ে দেখলাম তাতে আমারই ছবি।

'টোটা সিং', বলল মহাবীর, তার চোখ জ্বল জ্বল করছে।

টোটা সিং ? কী বলছে ছেলেটা পাগলের মতো। স্পষ্ট দেখছি যে আমার ছবি—সেই গোঁফ, সেই ঝুলপি, সেই নাক, সেই চোখ !

'টোটা সিং', আবার বলল মহাবীর। 'ঠিক তোমার মতো দেখতে। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে ছবি আটকে দিয়েছে আজই দুপুরে। ধরে দিতে পারলে দু হাজার টাকা পুরস্কার।'

আমি সেই অবস্থাতেই কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে চোখের একেবারে

সামনে এনে নীচের লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলুম। বড় করে লেখা টৌটা সিং-এর নামটা পড়তে কোনো অসুবিধা হল না। আর সেই সঙ্গে ছবির মাথার উপরে লেখা 'রিওয়ার্ড রুপীজ ২০০০।'

'পুলিশ তোমায় ধরতে আসবে,' বলল মহাবীর সিং। 'কিষণলাল বলল ও পুলিশে বলে দেবে তুমি এখানে থাক। ও দেখেছে দেয়ালের ছবি।'

কিষণলাল শেঠজীর দোকানের একজন কর্মচারী। লোকটা খুব সুবিধের নয় সেটা আমারও কয়েকবার মনে হয়েছে।

'তোমার জেল হবে,' বলে চলেছে মহাবীর সিং। আমার জেল হলে সে যেন রেহাই পায় এমনই তার ভাব। এই অদ্ভুত প্রায়-বেহুঁশ অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম যে এ ছেলেকে আমি বশ করতে পারিনি। সে আমার প্রতি যেমনি বিরূপ ছিল তেমনিই রয়ে গেছে।

আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। জিভও জড়িয়ে আসছিল। তার মধ্যেই বুঝতে পারছি যে একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়ে গেছি। চেহারায় যখন এতই মিল তখন গঙ্গারামও আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শেষটায় হাতে হাতকড়া!

ঘর থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে উঠোন পেরিয়ে কোনো মতে আমার শিস-মহলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, আর শোয়ামাত্র অঘোরে ঘুম!

পরদিন ঘুম ভাঙল পুরুষ মানুষের গলার শব্দে। ভারী গলায় কে যেন ইংরিজী-হিন্দী মিশিয়ে কথা বলছেন আমার ঘরের কাছেই।

'আমাদের ডেফিনিট ইনফরমেশন আছে এ বাড়িতে সে লোককে দেখা গেছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই। ছাব্বিশটা ঘর এই হাভেলিতে। লুকোবার জায়গার কি অভাব আছে?'

আমি প্রমাদ গুনলাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে আমারই ঘরের দিকে।

এবার গঙ্গারামের কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'এ বাড়িতে টৌটা সিং লুকিয়ে থাকবে আমার অজান্তে? এটা কী করে সম্ভব হয় ইন্স্পেক্টর সাহেব?'

দরজার বাইরে লোক। আমি বিছানায় কনুইয়ে ভর করে আধশোয়া। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, বুকের ভিতর ধড়ফড়ানি। এখনো মাথা ভার ; কাল যে কী হল এখনো বুঝতে পারছি না।

চৌকাঠ পেরিয়ে এক পা ঢুকে এলেন উর্দি পরা দারোগা। আমার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে 'সরি' বলে বেরিয়ে গেলেন। পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর বারান্দার

ডান দিক দিয়ে মিলিয়ে এল।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তাহলে কি কালকের ছবিটাও মহাবীরের আরেকটা বিচ্ছুমি? শুধু আমার মনে একটা প্যানিক সৃষ্টি করার জন্য?

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

দেয়ালের দিকে চোখ গেল।

দেয়ালে সর্বাঙ্গে আয়নার টুকরো। তাতে আমার মুখের ছায়া পড়েছে। একটা নয়, অগুনতি।

কিন্তু এ মুখ যে বদলে গেছে!

আপনা থেকেই আমার হাতটা মুখের উপর চলে এল।

কোথায় আমার টৌটা-মার্কা তাগড়াই গোঁফ? আমি যে ক্লীন-শেভ্‌ন!

আর আমার মাথার চুলের এ কী দশা? এ যে প্রায় কদম ছাঁট!

দোর গোড়ায় এখন দাঁড়িয়ে মহাবীর সিং—তার চোখে মুখে শয়তানী হাসি।

'কাল সরবতে কী ছিল?' সে জিজ্ঞেস করল।

'কী ছিল?'

'বাবার চারটে ঘুমের বড়ি। তুমি ঘুমোলে পর দাদার ক্ষুর দিয়ে আমি তোমার গোঁফ কামিয়ে দিই, আর কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে দিই। না হলে তোমায় ধরে নিয়ে যেত। এখন ওরা বুদ্ধু বনে যাবে।'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মহাবীরের দিকে। এমন ফন্দির কি তারিফ না করে পারা যায়? আর সে যে সত্যি আমার বন্ধু, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি আর আছে?

'সাবাস, মহাবীর', আমি এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললাম, 'জিতে রহো।'